গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৫ বর্ষ ৭ সংখ্যা | ৯ - ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

মহান মাও সে তুঙ স্মরণে

২৬ ডিসেম্বর ১৮৯৩ - ০৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬

"বিপ্লবী ক্যাডারদের শিক্ষাদানের জন্য যে জ্ঞানের দরকার এবং বিপ্লবী জনসাধারণকে শিক্ষাদানের জন্য যে জ্ঞানের দরকার— এই দুই জ্ঞানের মধ্যে যেমন মাত্রাগত পার্থক্য নিরূপণ প্রয়োজন, তেমনই তাদের পারস্পরিক সংযোগসাধনও প্রয়োজন; সংস্কৃতির মানের উন্নতিসাধনের সঙ্গে তার ব্যাপক বিস্তৃর পার্থক্য নিরূপণ এবং সংযোগসাধনও প্রয়োজন। বিপ্লবী সংস্কৃতি জনসাধারণের হাতে শক্তিশালী বিপ্লবী হাতিয়ার। বিপ্লব শুরু হওয়ার আগে বিপ্লবী সংস্কৃতি মতাদর্শের দিক থেকে বিপ্লবের পথ প্রস্তুত করে;বিপ্লবের সময়ে এই বিপ্লবী সংস্কৃতি সাধারণ বিপ্লবী ফ্রন্টের মধ্যে এক প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ফ্রন্ট। আর বিপ্লবী সাংস্কৃতিক কর্মীরা এই সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে বিভিন্ন স্তরের সেনাধ্যক্ষ। 'বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া বিপ্লবী আন্দোলন সম্ভব নয়'— এ থেকে দেখা যায় বাস্তব বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য বিপ্লবী সাংস্কৃতিক আন্দোলন কত গুরুত্বপূর্ণ। আর এই সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও বাস্তব আন্দোলন উভয়ই জনসাধারণেরই আন্দোলন।"

হায় রে গণতন্ত্র! জামিন পেতেও যেতে হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টে

ভারতীয় যুদ্ধজাহাজ বিক্রান্তকে জলে ভাসিয়ে যে-দিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি 'আত্মনির্ভরশীল ভারত'-এর গর্বে ছাতি ফোলালেন, ঠিক সেই দিনই সমাজকর্মী তিস্তা শেতলবাদকে দু'মাস জেলে কাটানোর পর জামিন পেতে সুপ্রিম কোর্টের শরণ নিতে হল। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি জানিয়েছেন, তিস্তাকে দুমাস জেলে আটকে রাখার কোনও কারণ ছিল না। নিম্ন আদালত, বিশেষত উচ্চ আদালতের উচিত ছিল তাঁকে জামিন দেওয়া। অথচ তা তারা দেয়নি। কেন দেয়নি? তার জন্য হাইকোর্টকে তীব্র ভর্ৎসনা করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

একজন মহিলা সমাজকর্মী, যিনি গুজরাট দাঙ্গায় আক্রান্ত এবং নিহতদের সুবিচারের জন্য লড়াই করে চলেছেন, তাঁকে বিনা কারণে দু'মাস জেলে আটকে রাখাটা দেশের পক্ষে গৌরবের কি না, সে-বিষয়ে অবশ্য প্রধানমন্ত্রীর মত জানা যায়নি। তবে দীর্ঘ এই দু-মাসে তাঁর নীরবতা থেকে প্রমাণ হয় একে তিনি কোনও অন্যায় বলে মনে করেন না। অবশ্য প্রধানমন্ত্রী যা-ই মনে করুন, দেশের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ, সভ্য নাগরিকরা সরকারের এই চরম অগণতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী মনোভাবে লজ্জিত। তাঁরা মনে করেন, বিজেপি সরকারের এই মনোভাব ভারতীয় গণতন্ত্রের পক্ষে চরম অগৌরবের, লজ্জার। তাই তিস্তার গ্রেফতারির প্রতিবাদ

ছয়ের পাতায় দেখুন

গুজরাটে বিলকিস বানোর গণধর্ষণকারী ও গণহত্যাকারীদের জেল থেকে ছেড়ে দেওয়ার প্রতিবাদে দেশ জুড়ে বিক্ষোভ এআইএমএসএস-এর। ছবিতে - মধ্যপ্রদেশের গুনা। ৩১ আগস্ট

গুজরাট গণহত্যার মামলা বন্ধের সিদ্ধান্ত গভীর উদ্বেগের

এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, ২০০২ সালে গুজরাটে সাম্প্রদায়িক গণহত্যার ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের দায়ের করা মামলাগুলি নিষ্পত্তি করার পরিবর্তে সুপ্রিম কোর্ট সেগুলিকে 'নিষ্ফলা' বলে অভিহিত করে ৩০ আগস্ট যে ভাবে ইচ্ছামতো সেগুলি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাতে আমরা গভীর ভাবে উদ্বিগ্ন । এই মামলাগুলির মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা মানবাধিকার কমিশনের দায়ের করা মামলাও রয়েছে। আমাদের মতে, এই সিদ্ধান্ত ন্যায়বিচারের হত্যার সামিল এবং ২০০২ সালের গুজরাট গণহত্যার অপরাধীদের পুরস্কৃত করার সমতুল্য।

সুপ্রিম কোর্টের প্রতি আমাদের আবেদন, এই চরম অন্যায্য আদেশ অবিলম্বে বাতিল করা হোক এবং মামলাগুলির যথাযথ বিচারের ব্যবস্থা করে যত দ্রুত সম্ভব আবেদনকারীদের প্রতি ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করা হোক। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকদের কাছে আমরা আবেদন জানাচ্ছি।

বিশ্ব যতই তাকাক, দেশের যুবকদের দিকে প্রধানমন্ত্রীরই নজর নেই

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মাসখানেক আগেই গলায় আবেগ ঢেলে বলেছেন, সারা বিশ্ব ভারতের যুবসমাজের দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু তিনি কি তাকাতে ভুলে গেছেন! না হলে ভারতে যুব সম্প্রদায়ই সবচেয়ে কম কাজের সুযোগ পাচ্ছে কেন? এমনিতেই তিনি ভুলেও আর বছরে দু'কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতির কথা মুখে আনছেন না। প্রতিশ্রুতির ফোয়ারা ছোটাতে স্বয়ং নরেন্দ্র মোদিকেও যখন ঢোক গিলতে হয়— ব্যাপারটা তখন কত গভীর তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। আর্থিক উপদেষ্টা সংস্থা সিএমআইই তাদের নিয়মিত সমীক্ষার ভিত্তিতে জানিয়েছে, ভারতে কাজের বাজারে এখন সবচেয়ে অবহেলিত অংশ হল ১৫ থেকে ৩৫ বছরের কর্মপ্রার্থীরা। অর্থাৎ এ দেশে যুবসমাজের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি হারে বাড়ছে বেকারত্ব। যুব-সম্প্রদায়ের মাত্র ১০.৪ শতাংশ কর্মপ্রার্থী বিগত আর্থিক বছরে কাজ পেয়েছে।

ক'দিন আগেই প্রধানমন্ত্রী সরকারি দপ্তরগুলিকে ১০ লক্ষ পদ পূরণের জন্য তৈরি হতে বলেছিলেন। সেটাও একটা জুমলা, নাকি সব নিয়োগই হবে 'অগ্নিপথের' স্টাইল মেনে, উত্তরটা জানা যায়নি। সম্প্রতি ব্যাঙ্কের ক্লার্ক থেকে অফিসার পর্যন্ত নিয়োগেও এই ফরমুলাই প্রয়োগ করতে চেয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সরকারি কাজের নামে যুবসম্প্রদায় নামমাত্র বেতনে অস্থায়ী চুক্তির ভিত্তিতে কয়েক বছরের জন্য নিযুক্ত হবে, তিন-চার বছর পর যুব বয়সেই তাঁরা 'রিটায়ার্ড' তকমা নিয়ে ফেলবেন! এরপর তাঁদের সংসার প্রতিপালনের উপায় কী হবে? উত্তর দেওয়ার দায় নিয়ে নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হননি! তাঁর 'মন কি বাত' জনগণকে শুনতে হয়, তিনি জনগণের কথা শুনবেন— এত সময় কোথায়?

বেশিদিন নয়, গত জানুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব ২০২১-এর প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক কর্মসংস্থান সমীক্ষার ত্রৈমাসিক রিপোর্ট হাতে নিয়ে জোর গলায় দাবি করেছিলেন, গত বছর জুনের তুলনায় সেপ্টেম্বরে ২ লক্ষ কর্মসংস্থান বেড়েছে। মন্ত্রীমশাইয়ের দুর্ভাগ্য— তাঁর অতবড় ঢাকটা অতি অল্প দিনেই ফেঁসে গেছে! সিএমআইই ২০২২-এর মে মাসে জানিয়েছে নতুন করে ১ কোটি ৪০ লক্ষ কর্মচারী কাজ হারিয়েছেন। এই সংস্থা জানিয়েছে, আগস্টে বেকারত্বের হার বেড়ে শহরে দাঁড়িয়েছে ৯.৭ শতাংশ, গ্রামে ৭.৬ শতাংশ। হরিয়ানা, জম্মু-কাশ্মীর, রাজস্থানের মতো কিছু রাজ্যে তা ৩০ শতাংশে পৌঁছেছে।

কেউ দাবি করতে পারেন ৯.৭ শতাংশ আর এমনকী চড়া বেকারত্বের হার! আসলে এখন প্রকৃত অর্থে বেকারত্বের হিসেব প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক সমীক্ষা থেকে পাওয়া যায় না। বেকারত্বের হার বলে যেটাকে দেখানো হয়, তা হল কাজের বাজারে কাজ খুঁজতে এসে কতজন কাজ পাননি, তারই শতাংশ ভিত্তিক হিসাব। জনসংখ্যার নিরিখে ধরলে ভারতে ১৫ থেকে ৬৫ বছর বয়সি কর্মক্ষম জনসংখ্যার ৫৩ শতাংশ পুরোপুরি রোজগারহীন। ৪৭ শতাংশ

দুয়ের পাতায় দেখুন

বর্তমান রাশিয়া একটি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রই

বিশ্বশান্তির অতন্দ্র প্রহরী সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রতিবিপ্লবের পর সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে অধঃপতিত রাশিয়া এখন পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নেরই অঙ্গরাজ্য ইউক্রেন আক্রমণ করে নির্বিচার হত্যা এবং ধ্বংসলীলা চালাচ্ছে। গোটা বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের প্রতিবাদ উপেক্ষা করে যেভাবে রাশিয়া তার সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের স্বার্থ চরিতার্থ করতে ইউক্রেনকে শ্মশানে পরিণত করছে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ইরাক, লিবিয়া, আফগানিস্তানে মারণযজ্ঞ চালানোর সঙ্গে তার কোনও পার্থক্য নেই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের মতো এশিয়া আফ্রিকার সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে অকুণ্ঠ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং একই সঙ্গে নিজেদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিটি নাগরিকের অন্ন বস্ত্র শিক্ষা চিকিৎসার সুব্যবস্থা করে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্প-সাহিত্য-খেলাধূলা প্রভৃতির অকল্পনীয় উন্নতির মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নকে সবদিক থেকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রে পরিণত করেছিল। যার ফলে বিশ্বজুড়ে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদে আস্থাশীল বামপন্থী মানুষরা তো বটেই, গোটা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষীমণ্ডলী সহ সর্বশ্রেণির শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ মানুষ সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং তার কর্ণধার মহান স্ট্যালিনের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত করতেন। সাম্রাজ্যবাদে অধঃপতিত পুতিন জমানার বর্তমান রাশিয়ার এই যুদ্ধবাজ মার্কিনি মূর্তি দেখে বিশ্ব জুড়ে শান্তি ও গণতন্ত্রকামী মানুষ রাশিয়ার বিরুদ্ধেধিক্কারে মুখর হয়েছেন। রাশিয়ার অভ্যন্তরেও ফ্যাসিস্ট পুতিনের চোখরাঙানি উপেক্ষা করে কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে বিশ্বাসী মানুষেরা রক্তপতাকা হাতে নিয়ে নিজ দেশের শাসক শ্রেণির এই যুদ্ধবাজ ভূমিকার প্রতিবাদ করছেন। এই অবস্থায় রাশিয়ার জনসাধারণ সহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সমাজতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পুতিন গোষ্ঠী এক নতুন শয়তানি প্রচার শুরু করেছে যে, পুতিন নাকি আবার সোভিয়েত ইউনিয়ন পুনর্গঠন করে তার গৌরবময় অতীতকে ফিরিয়ে আনতে চলেছেন। তারা এমনকি 'কমরেড পুতিন জিন্দাবাদ' বলে স্লোগানও দিচ্ছে।

ইতিহাস জানে যে, রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হওয়ার পর সৈন্য পাঠিয়ে গায়ের জোরে ইউক্রেন, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, বেলারুশ প্রভৃতি দখল করে লেনিন-স্ট্যালিন সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠন করেছিলেন এমন নয়। এই মিথ্যা আমেরিকা নেতৃত্বাধীন বনেদি সাম্রাজ্যবাদীরা প্রচার করেছিল। প্রকৃত ইতিহাস হল এই সব দেশগুলো ছিল মধ্যযুগীয় অন্ধ কুসংস্কারচ্ছন্ন, দরিদ্র, মূলত যাযাবর শ্রেণির জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত ছোটো বড়ো উপজাতীয় সর্দার, সুলতান প্রভৃতি শাসিত দেশ। জার আমলে শক্তিশালী রাশিয়া এদের ওপর যথেচ্ছ দখলদারি এবং অত্যাচার চালাত। রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং তার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বেরই মুক্তিকামী মানুষ নিজ নিজ দেশে শোষণহীন নতুন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে এবং মুক্তি সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। পার্শ্ববর্তী দেশ হওয়ার জন্য এইসব দেশেও দ্রুত রাজা-রাজড়া বা উপজাতীয় সর্দারদের শাসনের অবসান হয়ে সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। মহান স্ট্যালিনের উদ্যোগে ১৯২২ সালে একটি সম্মেলনে মিলিত হয়ে এইসব ছোট রাষ্ট্রগুলো রাশিয়ার সঙ্গে একটি সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে এবং যুক্ত রাষ্ট্রটির নামে রাশিয়া বা কোনও বিশেষ দেশের নাম না রেখে রাখা হয় ইউনিয়ন অফ সোভিয়েত সোস্যালিস্ট

পাঁচের পাতায় দেখুন

জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার দক্ষিণ লক্ষ্মীনারায়ণপুর অঞ্চল সম্পাদক কমরেড নটবর সরদার ১৮ আগস্ট হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষঃনিশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর।

লক্ষ্মীনারায়ণপুর অঞ্চলের অন্তর্গত ঘোড়াদল এলাকার কংগ্রেসী জোতদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) -এর নেতৃত্বে সত্তরের দশকে দীর্ঘস্থায়ী চাষি আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। তাতে আকৃষ্ট হয়ে সেই সময়ে একদল তরুণ যুবক দলে যুক্ত হন। কমরেড নটবর ছিলেন তাঁদেরই একজন। জোতদার পরিবারের সন্তান কমরেড নটবর সরদার তৎকালীন অঞ্চল কমিটির সদস্য কমরেড নিতাই পাইকের সান্নিধ্যে আসেন এবং ধীরে ধীরে তিনি সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হন এবং দক্ষিণ বারাশত কলেজে ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও গড়ে তোলার কাজে মন দেন। কমরেড রেণুপদ হালদার, কমরেড নলিনী প্রামাণিকের নেতৃত্বে এলাকায় বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আন্দোলন করতে থাকেন। সে সময়ে দলের নেতৃত্বে এলাকায় ব্যাপক চাষি আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে। এই আন্দোলনে কমরেড নটবর সরদার গুরুত্বপূর্ণ স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকা পালন করেন। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে পরিবহণের ভাড়া বৃদ্ধি, প্রাথমিকে পাশ ফেল এবং ইংরেজি তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে এলাকায় এবং কলকাতার আন্দোলনে শত শত মানুষকে সামিল করানোর কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। '৮৩ সালে বাসভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে পুলিশি নির্যাতনের মুখে পড়েন। তাঁর সাহসিকতা, উদারতা, পরোপকারিতা, স্পষ্টবাদিতা এলাকার গরিব মানুষকে বল ও ভরসা দিতে থাকে। দল গণভিত্তি পেতে থাকে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে গ্রাম সদস্য হিসাবে কমরেড নটবর সরদার ৪ বার জয়ী হন। দীর্ঘদিন ঘোড়াদল হাইস্কুলের সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। অবহেলিত ঘোড়াদল-মথুরাপুর রাস্তা উন্নয়নের আন্দোলনে নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেন। এলাকায় স্কুল, রাস্তাঘাট ও উন্নয়নের কাজে তিনি সব সময় এগিয়ে যেতেন। দীর্ঘদিন দলের দক্ষিণ লক্ষ্মীনারায়ণপুর অঞ্চল সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০১৩ সালে তৃণমূল কংগ্রেস তাঁকে খুনের মিথ্যা কেসে ফাঁসিয়ে জেলে পাঠায় এবং দীর্ঘদিন তাঁকে কারান্তরালে কাটাতে হয়।

জেলমুক্তির পর ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়েও দলমতের ঊর্ধ্বে উঠে গরিব মানুষের জমি জায়গা, সামাজিক কিংবা পারিবারিক নানা সমস্যা সমাধানে সাধ্যমতো চেষ্টা করতেন। করোনার মধ্যে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর যে কোনও সময়ে মৃত্যু হতে পারে জেনেও তিনি সামাজিক কাজে বিরত হননি। মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগেও কমরেড নটবর গরিব রোগীদের নিয়ে স্থানীয় হাসপাতালে গিয়েছিলেন। ছোট-বড় সব স্তরের কর্মী ও সাধারণ মানুষের সাথে তাঁর আবেগপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। ছোটদের নেতৃত্বে কাজ করতে তাঁর কোনও দিন অসুবিধা হয়নি।

তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল একজন লড়াকু সংগঠককে, এলাকার মানুষ হারাল তাঁদের একান্ত আপনজনকে। ৪ সেপ্টেম্বর ঘোড়াদল হাইস্কুলে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

কমরেড নটবর সরদার লাল সেলাম

প্রধানমন্ত্রীরই নজর নেই

একের পাতার পর

মাত্র কিছু কাজ পায়। করোনা মহামারির ওপরে যে দোষ চাপানো যাবে না। মহামারি আসার আগেই সরকারের সংস্থা ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে অরগানাইজেশন (এনএসএসও) জানিয়েছিল ২০১৯-এর আগেই ভারতে বেকারত্বের হার বৃদ্ধি ৪৫ বছরের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। সেই রিপোর্ট প্রকাশ না করে কেন্দ্রীয় সরকার সংগঠনটারই অস্তিত্বই বিলোপ করে দিয়ে তাকে স্ট্যাটিস্টিকাল অফিসে পরিণত করেছে।

ভারতের জনসংখ্যার অর্ধেকই হল ২৫ বছরের আশেপাশের যুবসম্প্রদায়। যে কোনও দেশের পক্ষেই এটা একটা বিরাট সম্পদ হতে পারে। কিন্তু যুবসমাজের শিক্ষিত অংশের চাকরি পাওয়াটাও অনিশ্চিত। সমীক্ষা দেখাচ্ছে ২০২১-এ গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রিধারীদের ১৯.১ শতাংশ চাকরি পায়নি। কিছু কিছু রাজ্যে এই বেকার গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা আরও বেশি। বিহারে তা ৩৪.২ শতাংশ। কর্ণাটকের আইটি সেক্টর বাদ দিলে বেশিরভাগ রাজ্যেই ১২ থেকে ১৫ শতাংশ গ্র্যাজুয়েট চাকরি পান না। তার মধ্যে আছে নরেন্দ্র মোদির রাজ্য গুজরাটও। ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের মতে ভারতের প্রতি ১০ জন গ্র্যাজুয়েটের মধ্যে মাত্র একজন ডিগ্রি অনুযায়ী চাকরি পেতে পারে। সে জন্যই বিজেপি শাসিত হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশই হোক কিংবা তৃণমূল শাসিত পশ্চিমবঙ্গই হোক, দেখা যায় পিওনের চাকরি, ডোমের চাকরির জন্য হাজার হাজার গ্র্যাজুয়েট, এমএ, পিএইচডি ডিগ্রিধারীরা দরখাস্ত নিয়ে লাইন দেয়।

যারা চাকরি একটা পাচ্ছেও তাদের মাত্র ২১ শতাংশ নিয়মিত বেতনে কাজ করে, ২৩ শতাংশ ক্যাজুয়াল লেবার এবং ৫৬ শতাংশই 'সেল্ফ এমপ্লয়েড'। নিয়মিতদের ৬৪ শতাংশেরই কোনও লিখিত কন্ট্রাক্ট নেই, ৪৮ শতাংশ একটাও সবেতন ছুটি পায় না। আর বেতনের পরিমাণ? মুকেশ আম্বানি ঘন্টায় ৯০ কোটি টাকা আয় করলেও বহু শ্রমিকের আয় দিনে ২০০ টাকারও কম। সরকারি তরফে দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি ৩১১ টাকা থেকে ৪৭৩ টাকা পর্যন্ত ধার্য করা আছে। সে টাকাতে এই মূল্যবৃদ্ধির বাজারে মানুষের কী হয় সে প্রশ্ন না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল, কিন্তু এই টাকাই পায় কতজন?

স্বাধীনতার ৭৫ বছরে অমৃত মহোৎসবের জেল্লাদার উৎসব এই অন্ধকারকে কি ঢাকতে পারে? যে দেশের জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ যৌবনের শক্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সে দেশে কীসের অভাব? প্রাকৃতিক সম্পদ অঢেল। প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মানব সম্পদ ব্যবহার করে মানুষের জন্য বিপুল উৎপাদন সম্ভব। তাতে প্রতিদিন কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়ে চলার কথা। কারখানা বন্ধ হওয়া দূরে থাক, এত মানুষের প্রয়োজন মেটাতে আরও বেশি কারখানা খেলার কথা। অথচ যে সব কারখানা আছে তাতেই উৎপাদন হচ্ছে না, প্রতিদিন কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে। কর্মসংস্থান বাড়া দূরে থাক তা দিনে দিনে কমছে।

কেন এমন হচ্ছে? নরেন্দ্র মোদিরা যখন বিরোধী দলে ছিলেন, তখন বলতেন কংগ্রেস সরকারের জন্য বেকারত্ব বাড়ছে। কংগ্রেস এখন বলছে বিজেপি সরকারের জন্য বেকারত্ব বাড়ছে। যেমন পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম গদিতে থাকার সময় বেকারত্বের জন্য তৃণমূল তাদের দিকে আঙুল তুলত, এখন সিপিএম বলছে এদের হঠিয়ে আমরা ক্ষমতায় এলেই বেকারত্বের অবসান হবে! কিন্তু সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা, যে দলই সরকারি গদিতে বসুক, নতুন নতুন কলকারখানা খোলা, বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টি বা বেকারত্বের অবসান ঘটানোর চেষ্টা কেউই করতে পারে না। কেন? সত্যটা আসলে তারা কেউই বলে না। এরা সরকারে যায় পুঁজিপতি শ্রেণির সেবা করতে। ঝান্ডার রঙ তাদের যাই হোক এই চরিত্রে তারা এক। আর পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজিপতিরা উৎপাদন করে নিজেদের সর্বোচ্চ মুনাফার দিকে লক্ষ্য রেখে। যতটুকু উৎপাদন করলে তাদের সর্বোচ্চ মুনাফা হতে পারে তার বেশি উৎপাদন তারা করতে দেয় না। এর সঙ্গে প্রতিনিয়ত শ্রমিকের উপর চলা নির্মম শোষণে দেশের বেশিরভাগ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমাগত কমতে থাকে। ফলে তীব্র বাজার সংকটে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ভুগতে থাকে। এর মধ্যে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি বিপুল মুনাফা তুলে নিতে পারে, দুচারটে কারখানাও খুলতে পারে। কিন্তু তাতে কর্মসংস্থান হয় না। বরং চলতে থাকে শ্রমিক ছাঁটাই।

যে দলই সরকারে যাক, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সেবা করে এই চিত্র তাদের পক্ষে পাল্টানো সম্ভব নয়। এই সত্যটা জনগণকে বুঝতে হবে। কর্মসংস্থানের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেকার যুবকদের ঠকিয়ে ভোট জোগাড়ের এই চক্রকে ভাঙতে গেলে দরকার কর্মসংস্থানের দাবিতে লাগাতার আন্দোলন। যে পথে কিছুটা হলেও শ্রমনিবিড় শিল্প গড়ে তুলতে সরকারকে বাধ্য করা যেতে পারে।

শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষে তাঁর অমূল্য শিক্ষা

৫ আগস্ট ১৯২৩ - ৫ আগস্ট ১৯৭৬

"মার্কসবাদ বলছে— এই যে আমাদের সমাজ, এই যে আমরা সোস্যাল বিইং, এখানে মানুষে মানুষে সম্পর্ক হল উৎপাদন সম্পর্ক। অনেকে মনে করেন, বহু পণ্ডিতেরা মনে করে, মার্কসবাদের এই কথাটা ঠিক নয়। কারণ, বাবা-মার সাথে সন্তানের সম্পর্কটা কি উৎপাদন সম্পর্ক? উৎপাদন সম্পর্ক বলতে এই মূর্খের দল মনে করছে শুধু আর্থিক সম্পর্ক। না, তা নয়। মার্কসবাদ যখন উৎপাদন সম্পর্ক বলেছে, তখন নিছক আর্থিক সম্পর্ক বলেনি। কারণ মার্কসবাদ যখন উৎপাদন কথাটা বলেছে, তখন দুই উৎপাদনের কথাই বলছে। একটা হল মেটেরিয়াল উৎপাদন বা বস্তুগত উৎপাদন এবং অপরটি হল, স্পিরিচুয়াল উৎপাদন বা ভাবগত উৎপাদন। মানুষের উৎপাদন সৃষ্টির দুটি দিক আছে — একটি তার ব্যবহারিক জীবনে লাগে, তাকে আমরা বলি মেটেরিয়াল প্রোডাকশন; আর একটি মনের খোরাক সৃষ্টি করে, যাকে আমরা বলি ভাবগত উৎপাদন। যার থেকে শিল্প-সাহিত্য, কৃষ্টি, ভাবধারা, নীতিনৈতিকতা, ধর্ম, ঐতিহ্য, আদর্শবাদ, বিপ্লববাদ এই সবের জন্ম। এই সবই তো মনুষ্য সৃষ্ট। তাহলে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে বাঁচার তাগিদে হাতে-কলমে কাজ করতে গিয়ে দুরকম উৎপাদন করেছে, একই সঙ্গে মেটেরিয়াল প্রোডাকশন আর স্পিরিচুয়াল প্রোডাকশন। এই দুটি উৎপাদনই সে করেছে একদিকে নিজে তা ভোগ করার জন্য এবং অন্যদিকে নিজের বিকাশের জন্য — ব্যক্তির এবং সমাজের বিকাশের জন্য, সভ্যতার বিকাশের জন্য, সমাজের অগ্রগতির জন্য। কাজেই উৎপাদন হচ্ছে মানুষের ক্রিয়ার ফল, মস্তিষ্কের চিন্তাগত ক্রিয়ার ফলে ভাবগত উৎপাদন এবং শারীরিক ও চিন্তাগত ক্রিয়ার সংমিশ্রণের ফলে মেটেরিয়াল উৎপাদন।

যাই হোক, উৎপাদন সম্পর্ক বলতে মার্কসবাদ বলতে চেয়েছে একটি মূল্যবান কথা— এই সমাজ উৎপাদন করার প্রক্রিয়ায় গড়ে উঠেছে। সকল মানুষ বাঁচার তাগিদে উৎপাদন করতে গিয়ে পরস্পর সম্বন্ধিত হয়েছে, তবেই আমরা সমাজবদ্ধ হয়েছি, তবেই আমরা সামাজিক জীব হয়েছি। তা না হলে আমাদের সাথে জন্তু-জানোয়ারের কোনও পার্থক্য নেই। আমরা শুধু একসঙ্গে থাকি বলেই আমরা সামাজিক জীব নই। তাহলে পিঁপড়েকেও তো সামাজিক জীব বলা যেত। আমরা কি পিঁপড়েকে সোসাল বিইং বলি? হাতিরাও একসঙ্গে থাকে, তাই বলে কি হাতিকে আমরা সোস্যাল বিইং বলি? আমরা প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে বাঁচার তাগিদে সম্মিলিতভাবে উৎপাদন করছি, এক সঙ্গে উৎপাদন করছি এবং একত্রে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সচেতনভাবে লড়াই করতে গিয়ে উৎপাদনের জন্ম দিচ্ছি, উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তুলছি। এই উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রক্রিয়াতেই আমরা সামাজিক জীব।

তাই উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে, উৎপাদনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে ইতিহাসের বিকাশের কোনও স্তরেই এবং কোনও সময়েই মানুষ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে না। সমাজবদ্ধ মানুষ সমাজে বাস করবে আর উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক থাকবে না, তা হলে এই সম্পর্কটা তার কী ধরনের? সে সক্ষম হতে পারে, অক্ষম হতে পারে, আংশিক বুঝতে পারে, অর্ধসত্য আবিষ্কার করতে পারে, পুরো সত্য আবিষ্কার করতে পারে, কিন্তু সে বুঝুক আর না বুঝুক, উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে তার সম্পর্ক বোঝা না বোঝার উপর নির্ভর করবে না। ইট ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ হিজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং। হি ক্যান নট বাট এস্ট্যাবলিশ সাম সর্ট অফ রিলেশন উইথ এগজিস্টিং প্রোডাকশন সিস্টেম। সেজন্যই বলছিলাম, হোয়াট ইজ দ্যা অনারেবল ওয়ে অফ লিডিং আওয়ার লাইফ? কেউ যদি মনে করে আমি মর্যাদার সঙ্গে জীবনযাপন করব, আমি কারও সাতেও নেই, পাঁচেও নেই, কাউকে শোষণও করব না, জুলুমও করব না, আমি শুধু ডাক্তারি করব, না হয় শুধু মাস্টারি করব। তা হয় না কি? এ হয় না, হতে পারে না। আমি কি জানি মেডিকেল প্রফেসনে কাউকে ঠকাবো না ভেবে ডাক্তারি করতে গেলেও আমি মানুষকে না ঠকিয়ে প্রফেসনে এক পাও এগোতে পারি না। কাজেই অনারেবল ওয়ে অফ লাইফ লিড করার এসব উপায় নয়। আবার এই সবগুলোই মানব কল্যাণের কাজে আমি লাগাতে পারি। মাস্টার তার শিক্ষা দেওয়ার কাজটাকে, ডাক্তার তার চিকিৎসা করার কাজকে, ইঞ্জিনিয়ার তার যন্ত্রবিজ্ঞান ব্যবহার করার কাজকে হিউমিলিয়েশন থেকে মুক্ত করে সমাজপ্রগতির কাজে লাগাতে পারে যখন বিপ্লবী সংগ্রামের অগ্রগতির সহায়ক ওপরিপূরক অর্থে তার ব্যবহার হবে। তখনই সে এটা একমাত্র পারে। বাকিটা হল সে চাক বা না চাক, কনশাসলি বা আনকনশাসলি, ডায়রেক্টলি বা ইনডায়রেক্টলি সার্ভিং দ্য এক্সপ্লয়টেটিভ সিস্টেম, প্রফিট মেকিং মোটিভ অফ দ্য সোসাইটি। এগজিস্টিং সোসাইটির সোস্যাল সেটআপ, মেন্টাল মেকআপ, তার মানসিকতা;তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য তার ধ্যানধারণার যত বিচিত্র রকম রূপ— তা হল মানুষকে অ্যাপলিটিক্যাল করার জন্য। যে সংগ্রামে সমাজ একমাত্র পাল্টাতে পারে, যে সংগ্রামের দ্বারা এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পাল্টাবে, এই জগদ্দল পাথর হটানো যাবে, যে সংগ্রাম দ্বারা সমাজের বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন হতে পারে, প্রগতি আসতে পারে, সেই সংগ্রামটাকে বুর্জোয়ারা যেমন সরাসরি বিরুদ্ধতা করে, আবার. অন্য নানা কৌশলেও বিরুদ্ধতা করে। রাজনীতির কথা সে একদম বলছে না, কিন্তু এমন সব ধ্যান ধারণা সে চালু করছে, এমন সব দৃষ্টিভঙ্গি এনে দিচ্ছে, এমন সব নীতিনৈতিকতার ধারণা সৃষ্টি করছে, এমন সব ফিলানথ্রপিক সমাজসেবার ধারণা সৃষ্টি করছে, যার দ্বারা মানুষের সমাজের প্রতি কল্যাণ করার মনোভাব বিপ্লবমুখী না হয়ে ফিলানথ্রপিক রামকৃষ্ণ মিশন বা মিশনারীদের মূর্তি হয়ে বিপ্লবের পথটাকে আটকে দেয়। তেমন ডাক্তারের, ইঞ্জিনিয়ারের, মাস্টারমশাইদের মনোভাব কিছু সমাজসেবা আর উদার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে আটকে পড়ে থাকে, অর্থাৎ সমাজবিপ্লবে যেন না যায়। যেখানে সরাসরি সমাজবিপ্লব খারাপ বলা চলে সেখানে তাই বলছে, যেখানে সমাজবিপ্লবের কথা খারাপ বলে লোকজনদের আটকানো যাবে না, সেখানে বলছে মানুষের সেবা করাও তো একটা কাজ। এটা না হয় না পারো, ওটা করো। অর্থাৎ আসল কথা হচ্ছে, যে বিপ্লবের মাধ্যমে, যে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সমাজের পরিবর্তন হবে, যে কোনও কৌশলে যে কোনও নীতি, যে কোনও আদর্শের কথা বলে, যে কোনও তত্ত্ব আউড়ে মানুষকে যতদূর সম্ভব তার থেকে বাইরে রাখার কৌশল। কাজেই, এই যে সব থিওরি, আমি সেবা করব, আমি মড়া পোড়াবো, আমি দুঃস্থ মানুষকে খেতে দেব, আমি যদি পয়সা-টয়সা রোজগার করি, তবে আর কিছু পারি না পারি গ্রামের গরিব মানুষদের মুখে তো দুটো অন্ন তুলে দিতে পারি। এটাও তো একটা কাজ। হ্যাঁ, খুব বড় কাজ। আমরাও করি, কিন্তু বিপ্লবীরা এই কাজটা করে মানুষকে বাঁচাবার জন্য বিপ্লবের সহায়ক সংগ্রাম অর্থে। বিপ্লবকে কাউন্টারপোজ করে নয়। বিপ্লবী আন্দোলনের পাশাপাশি একটা আন্দোলনের অর্থে নয়। সেই জন্য বিপ্লবীদেরও অনেক সময় রিলিফ ওয়ার্ক করতে হয়। এই ধরনের কাজ বিপ্লবীরা করে এই অর্থে। আবার অনেকেই করে, ছেলেদের একটা স্পোর্টসের বন্দোবস্ত করে দেওয়া, লাইব্রেরি করে দেওয়া, ডনখানায় শরীরচর্চা করার ব্যবস্থা করে দেওয়া। তা শরীর ভাল হয়ে কী হয়, তারপর গোপাল পাঁঠার দল তাদের টেনে নেয়। ডনবৈঠক করে সব যখন তাগড়াই হল, বুকের ছাতি মেপে দেখলো তৈরি হয়েছে, তখন আমাদের দেশে সব ক্ষমতাশীল দল রয়েছে তারা সব টেনে নিচ্ছে তাদের দিকে যাও, কিছু পয়সা পাবে। তার দ্বারা কী কাজ হচ্ছে, বুকের ছাতি বেড়েও কিছু লাভ হয় না। আসল কথা হচ্ছে, যে কারণের জন্য সবল সুস্থ করে যুবকদের গড়ে তুলতে হবে, সেটাতো বিপ্লবী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য। তাহলে সেই বিপ্লবী সংগ্রাম থেকে খানিকটা পথভ্রষ্ট করার জন্য অনেক রকমের রাস্তা ওরা বের করে। কোথাও রামকৃষ্ণ মিশনের সেবার কাজ মানে সেবাধর্ম, কোথাও স্কুল, কোথাও ফিলানথ্রপিক অ্যাটিচিউড, কোথাও ভূদান, কোথাও এটা, কোথাও সেটা। কোথাও একজন মনে করল আর কিছু না পারি অন্তত একটা দানখয়রাত করে কিছু গরিব মানুষের কিছুটা উপকার করছি, লোকগুলো বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে বিনা পয়সায় তাদের চিকিৎসা করছি। আমি তো আর কিছু পারছি না। এই কাজটা করছি। একবারও ভাবছে না যে আপনি অন্য কিছু করতে পারছেন না, এ কথাটা এভাবে ধরলেন কেন? যে লোকের এতখানি ত্যাগ করার শক্তি, তার দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক হলে সে কি বিপ্লবী আন্দোলনের সহায়ক কাজ করতে পারত না? না আপনি ধরে নিয়েছেন, এই দান খয়রাত করাটা একটা মহৎ কাজ। হ্যাঁ, এটা একটা মহৎ কাজ। এইভাবে গরিবদের সঙ্গে থাকা, তাদের কথা শোনা, তাদের উপকার করা মহৎ কাজ, যদি এই কাজের দ্বারা তাদের এডুকেট করতেন যে তোমাদের সংঘবদ্ধ হওয়ার দরকার। তোমাদের সংঘবদ্ধ হয়ে এই সমাজের বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আনার জন্য বিপ্লবী দল গঠন করা দরকার। গরিব মানুষের মুখে অন্ন জোগাতে গিয়ে, সেবা করতে গিয়ে যদি এই কথাগুলো বলতেন এবং এই সংগঠন জনতার মধ্যে গড়ে তুলতেন, তাহলে এই কাজটা ছিল যথার্থ কাজ। তাহলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা নয় — বিপ্লবের সহায়ক কাজ, বিপ্লবের উপকারী কাজ হতো। তা এই সমাজে আমরা চাই বা না চাই, উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন না করে আমরা কোনও মতেই চলতে পারি না। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক আমাদের খাওয়া-পরা, নীতিনৈতিকতা, ধ্যান ধারণা যা কিছু আমরা লালন পালন করি, শোষক শ্রেণির স্বার্থের অনুকূলে যেগুলো এই সমাজে রয়েছে, আমরা যদি সেগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হই এবং সেগুলোকে নিতে থাকি উইদাউট অ্যাটেম্পটিং টু ব্রিং অ্যাবাউট এ চেঞ্জ অফ দ্য সোসাইটি, তবে আমরা জেনে হোক, না জেনে হোক, পুঁজিবাদী স্বার্থেরই পৃষ্ঠপোষকতা করি। ফলে এখানে আমি কমপ্রোমাইজ করছি। আমি এইরকম মনে করি না যে, মালিক আমাকে যে পয়সাটা দিচ্ছে, প্রভু আমাকে যে পয়সা দিচ্ছে, গোলামের মনোভাব থেকে আমি সে পয়সাটা নিচ্ছি না। আমি জানি, আমি ডিপ্রাইভড। আমি জানি আমাকে এক্সপ্লয়েট করা হচ্ছে। আমি জানি আমার ন্যায্য হক চুরি করে, ফাঁকি দিয়ে, নানা কৌশলে আত্মসাৎ করা হচ্ছে। আমি সেইজন্য এনগেজড ইন পুটিং অ্যান এন্ড টু দিস এক্সপ্লয়টেশন। এই সংগ্রামে আমি যদি নিয়োজিত না থাকি তবে আমি একজন আনকনসাস ওয়ার্কার, যে ওয়ার্কার হয়েও, এক্সপ্লয়েটেড হয়েও ইনস্ট্রুমেন্টাল ইন মেনটেনিং এন্ড স্ট্রেনদেনিং দ্য ক্যাপিটালিস্ট সিস্টেম হয়েছি। ওয়ার্কার হয়ে কাজ করে আমি শোষিত বলেই যে পুঁজিবাদী সমাজকে সার্ভ করছি না, তা নয়। একমাত্র ক্লাস কনসাস ওয়ার্কার যে এক্সপ্লয়টেশনের স্বরূপ আন্ডারস্ট্যান্ড করে এবং তাকে দূর করার জন্য শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলে, বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলায় আত্মনিয়োগ করে, সেই মজুর গোলামির মনোভাব থেকে মুক্ত। সে মজুর বাস্তবে মালিকি ব্যবস্থার অবসানের সংগ্রামে নিয়োজিত আছে বলে সে কিন্তু হিউমিলিয়েশন থেকে মুক্ত। সে ক্যাপিটালিজমকে সার্ভ করছে না। সে সোসাল প্রগ্রেসের আন্দোলনকে সার্ভ করছে। ফলে সে ক্লাস কনসাস।"

'বিপ্লবী জীবনই সর্বাপেক্ষা মর্যাদাময়' বই থেকে

১৯৫৯ সালে খাদ্য আন্দোলনের শহিদ ও ১৯৯০ সালে বাসভাড়া বৃদ্ধি আন্দোলনে কিশোর শহিদ

কমরেড মাধাই হালদার স্মরণে

৩১ আগস্ট কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে শহিদ বেদিতে মল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এসপ্ল্যানেডে কমরেড মাধাই হালদারের শহিদ বেদিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, পলিটবুরো সদস্য কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী, কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত গৌড়ী সহ রাজ্য ও জেলা নেতৃবৃন্দ। আঞ্চলিক কমিটি ও গণসংগঠনগুলির পক্ষ থেকেও মাল্যদান করা হয়।

বন্দি ছাত্রনেতাদের মুক্তিতে সংবর্ধনা কোচবিহারে

১৩ দিন জেল হেফাজতের পর অবশেষে ৩১ আগস্ট জামিন পেলেন কোচবিহারের এআইডিএসও-র আন্দোলনকারী ছাত্রনেতারা। ১৬ আগস্ট হলদিবাড়ি কলেজে সংগঠনের নেতৃত্বে ফি-বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনে পুলিশ নির্মম আক্রমণ চালায়। পরদিন এসপি অফিসে স্মারকলিপি দিতে গেলে পুলিশ আবার ছাত্রদের ওপর চড়াও হয় ও অন্যায়ভাবে ১৩ জনকে গ্রেফতার করে।

এই গ্রেফতারের প্রতিবাদে ও ছাত্রছাত্রীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে প্রচার, সভা, জেলাজুড়ে ছাত্র ধর্মঘট ও কেন্দ্রীয় ভাবে কলকাতা ও শিলিগুড়ি শহরে ছাত্র বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত হয়। কোচবিহার বার অ্যাসোসিয়েশন-এর ৩০ জনের বেশি বিশিষ্ট আইনজীবী মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জামিনের জোরালো যুক্তি উপস্থিত করেন এবং ছাত্রনেতারা জেল থেকে ছাড়া পান। এআইডিএসও-র পক্ষ থেকে ডিস্ট্রিক্ট জেলের সামনে মুক্তিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করা হয়। বৃষ্টির মধ্যেও একটি স্লোগানমুখরিত তেজোদীপ্ত অভিনন্দন ও সংবর্ধনা মিছিল কোচবিহার শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে। দাস ব্রাদার্স মোড়ে সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলমুক্ত ছাত্রদের পক্ষ থেকে দু'জন বক্তব্য রাখেন, বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক জহিদুল হক এবং সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মণিশঙ্কর পট্টনায়ক। সভা শেষে মিছিল করে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর মূর্তির সামনে উপস্থিত হয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন মুক্তিপ্রাপ্ত ছাত্র নেতারা।

মণিশঙ্কর পট্টনায়ক বলেন, ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের উপর রাষ্ট্রীয় আক্রমণ এই প্রথম নয়, যুগে যুগে শাসক সম্প্রদায় প্রতিবাদী আন্দোলনে এরকম স্বৈরাচারী আক্রমণ ও মিথ্যা মামলা চাপিয়ে আন্দোলনকে দমন ও আন্দোলনকারীদের মনোবল ভাঙতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছে। আজ যে সকল ছাত্র প্রতিনিধি কারামুক্ত হলেন, আগামী দিনেও তাঁরা সংগ্রামী ঝান্ডা হাতে নিয়ে ছাত্র আন্দোলনে থাকবেন।

রাজ্যের ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক আইনজীবী সহ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন গণতন্ত্রপ্রিয় নাগরিকরা, বিশেষ করে কোচবিহার জেলাবাসী যেভাবে ছাত্র আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করেছেন তার জন্য তিনি তাঁদের অভিনন্দন জানান।

বাস চালানোর দাবিতে জলপাইগুড়িতে রাস্তা অবরোধ

প্রায় এক বছর ধরে জলপাইগুড়ি শহরের ভেতর দিয়ে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার বাস চলাচল নিষিদ্ধ রয়েছে। ফলে হলদিবাড়ি-জলপাইগুড়ি রুটের সরকারি বাস প্রায় ১০ কিমি ঘুরপথে অতিরিক্ত আধ ঘন্টা বেশি সময় নিয়ে শান্তিপাড়া বাস ডিপোতে পৌঁছচ্ছে। এতে যেমন সময় নষ্ট হচ্ছে, তেমন অতিরিক্ত খরচও হচ্ছে যাত্রীদের। দিনমজুর, ছাত্রছাত্রী, অফিসকর্মী, শ্রমিক বা অন্যান্য সাধারণ মানুষ সমস্যায় পড়ছেন প্রতিনিয়ত। বহুবার প্রশাসন ও সংস্থাকে জানানো হলেও কারও হেলদোল নেই।

অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধান, রুটে বাসের সংখ্যা ও বাসের ট্রিপ সংখ্যা বাড়ানো, স্ট্যান্ড থেকে ২০-৩০ মিনিট অন্তর বাস চালানো প্রভৃতি দাবিতে ৩ সেপ্টেম্বর হলদিবাড়ি কালীবাড়ি মোড় অবরোধ করেন হলদিবাড়ি-জলপাইগুড়ি রুটের নিত্যযাত্রীরা। গণস্বাক্ষর করে জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, পৌরসভা এবং ডিপোতে দাবিপত্র দেওয়া হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে দ্রুত সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতিতে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। দাবি পূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেন নিত্যযাত্রীরা।

শহিদ বেদিকেও ভয়!

১ সেপ্টেম্বর ছাত্র শহিদ ও গণআন্দোলনের শহিদদের স্মরণে এআইডিএসও কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে যাদবপুর কফি হাউসের সামনে একটি শহিদ বেদি নির্মাণ করা হয়। উদ্বোধনের ঘণ্টা খানেক আগে হঠাৎ পুলিশ এসে বেদি ভেঙে দেয় এবং এআইডিএসও-র তিনজন কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। এলাকার মানুষ পুলিশের এই স্বৈরাচারী ভূমিকার তীব্র নিন্দা করেন। প্রতিবাদে ছাত্ররা যাদবপুর থানা অভিযান করে এবং গ্রেপ্তার হওয়া তিন সাথীকে মুক্ত করে আনে। এর পর নির্ধারিত স্থানেই সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি কমরেড মৃদুল সরকার শহিদ বেদি উদ্বোধন করেন। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সভাপতি কমরেড সামসুল আলম।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রতিরোধে ১৪ সেপ্টেম্বর মিছিলে প্লাবিত হবে কলকাতা

মেদিনীপুরের রঘুনাথবাড়ি হাইস্কুলের গেটে ক্লাস সেভেন এইট নাইনের ছাত্ররা ঘিরে ধরেছে দুই এআইডিএসও কর্মীকে। 'দিদি কাল আসবে তো? আমার ক'জন বন্ধু আজ আসেনি। ওদের সইটা নিতে হবে। তুমি বরং এক কাজ করো। দুটো ফর্ম আমাকে দাও। একটা দেবো স্কুলের বন্ধুদের, আর একটা পাড়ায়।'

'এই কি করছিস রে', ক্লাস নাইনের এক ছাত্র হাঁক দেয় সেভেনের ছাত্রকে। সে উত্তর দেয় 'স্কুল বেসরকারি হয়ে যাবে। প্রচুর টাকা দিয়ে পড়তে হবে। এটা যাতে না হয় তার জন্য সই করতে হচ্ছে।' নাইনের ছাত্রটি জিজ্ঞাসা করে 'কোথায় সই করতে হবে বলো। আমি আমার বন্ধুদেরও সই করিয়ে দিতে পারি।'

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নম্বর গেটেও চলছিল স্বাক্ষর সংগ্রহ। এআইডিএসও কর্মীরা সমস্ত ছাত্রদের কাছে আবেদন জানাচ্ছিল, ছাত্ররাও সই করছিল। পাশে এসে দাঁড়ালো মাস্টার ডিগ্রির এক দৃষ্টিহীন ছাত্র। জিজ্ঞেস করল টিপ ছাপ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে? তেমন কিছু ব্যবস্থা না থাকায় বলল, আমার নামটা তোমরাই লিখে দাও।' বেশ কিছুক্ষণ পাশে দাঁড়িয়ে থেকে এআইডিএসও কর্মীদের সাথে অন্য ছাত্রদের কাছে সে-ও সই করার আবেদন জানাল। মুর্শিদাবাদের এক স্কুলে মাত্র একজন শিক্ষক ছাড়া সেই দিন উপস্থিত সমস্ত ছাত্র-শিক্ষকই সই করেন। বাঁকুড়া শহরে প্রচার অভিযান চলার সময় এক ভদ্রলোক সই করে আন্দোলনে অর্থ সাহায্য করেন এবং এআইডিএসও কর্মীদের তার এলাকায় যাওয়ার আবেদন জানান। যেদিন তাঁর গ্রামে যাওয়া হয় সেদিন অসুস্থতা সত্ত্বেও স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী পাওয়া যাবে এমন কুড়িটি বাড়িতে তিনি এআইডিএসও কর্মীদের নিয়ে যান। ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একটি বৈঠক করে জাতীয় শিক্ষানীতির ভয়াবহতা তাদের কাছে তুলে ধরার প্রস্তাব করেন তিনি।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রতিরোধে এআইডিএসও সর্বভারতীয় কমিটির আহ্বানে দেশব্যাপী যে এক কোটি স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান সারা রাজ্যে এমনই গণচরিত্র অর্জন করেছে। সরকার এমন প্রচার করে যেন, ছাত্র-ছাত্রীরা সব ফাঁকিবাজ, তারা পরীক্ষার ভয়ে ভীত। অথচ মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা আর থাকবে না, শিক্ষা হবে অনলাইন ভিত্তিক, জাতীয় শিক্ষানীতির এই প্রস্তাব ছাত্ররা যখন জানছে, রাগে-ক্ষোভে ফেটে পড়ছে। স্বাক্ষর সংগ্রহে তাদের আগ্রহ, উৎসাহ দ্বিগুণ হয়ে উঠছে। অভিভাবকরা যখন শুনছেন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে তুলে দেওয়া হবে পরিকাঠামোহীন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের হাতে। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত কোনও বিষয়ভিত্তিক বই থাকবে না, স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে বৃত্তিমুখী শিক্ষার আয়োজন

পাঁচের পাতায় দেখুন

রাশিয়া সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র

দুয়ের পাতার পর

রিপাবলিক বা ইউএসএসআর। যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে সবকটি অঙ্গ রাজ্যকেই ইচ্ছেমতো যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে যাওয়ারও সুযোগও দেওয়া হয়েছিল। এর সঙ্গে সৈন্য পাঠিয়ে একটি পার্শ্ববর্তী দুর্বল দেশে ধ্বংস ও হত্যালীলা চালিয়ে তাকে পদানত করার সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের কোনও সম্পর্ক নেই। সোভিয়েতে প্রতিবিপ্লবের পর গর্বাচেভ-ইয়েলেৎসিন চক্রের সমর্থন নিয়ে মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা সিআইএ প্রভৃতিরা এইসব রিপাবলিকগুলোর ভিতরের ক্ষমতালিপ্সু

যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনের ধ্বংসচিত্র

গোষ্ঠীকে ব্যবহার করে ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ভেঙে দেয় যাতে ছোট ছোট দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে নিজের প্রভাবাধীনে আনতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সুবিধে হয়। আজকে তিরিশ বছর বাদে পুঁজিবাদী রাশিয়া শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে সম্পূর্ণ নিজের সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের স্বার্থ চরিতার্থ করতে ইউক্রেন আক্রমণ করেছে।

পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নে, প্রতিবিপ্লব সম্পন্ন হওয়ার আগে রাষ্ট্রের উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল সমাজতান্ত্রিক। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কলকারখানা, জমি, খনি প্রভৃতি সমস্ত উৎপাদন ক্ষেত্রেরই একমাত্র মালিক রাষ্ট্র। কোনও ব্যক্তি মালিকের মালিকানার অধিকার সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। প্রতিটি নাগরিককেই সেখানে নিজ যোগ্যতা ক্ষমতা অনুযায়ী কোনও না কোনও কাজ করতে হয় এবং সকলের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা সহ জীবনের প্রতিটি প্রয়োজনের সুব্যবস্থা করা হয় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়। কিন্তু প্রতিবিপ্লব সম্পন্ন হওয়ার পরে সেখানে নানা শক্তিশালী পুঁজিপতির উদ্ভব হয়েছে যাদের সম্পদের পরিমাণ আমেরিকা ইউরোপের ধনকুবেরদের থেকে কিছু কম নয়।

ফোর্বস সংস্থার তালিকা অনুযায়ী বর্তমান বিশ্বের সর্ববৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মধ্যে গ্যাজপ্রোম, লুকোইল, রোজনেফট, স্বেরব্যাংক প্রভৃতি ২৮টি রাশিয়ান কোম্পানি রয়েছে। ২০০৬ সালে রাশিয়ার জিডিপির ২৮.৯ শতাংশেরই মালিক ছিল মাত্র দশটি বৃহত্তম রুশ একচেটিয়া পুঁজি। বর্তমানে বিদ্যুৎ, কারিগরি শিল্প, পরিবহণ এমনকি খাদ্যোৎপাদন সহ রুশ অর্থনীতির অধিকাংশই একচেটিয়া পুঁজিপতিদের করায়ত্ত। অর্থাৎ পুঁজিবাদী রাশিয়া এখন একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীভূত একচেটিয়া পুঁজিশাসিত রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। লেনিন দেখিয়েছেন যে, একচেটিয়া পুঁজি তার সর্বোন্নত স্তরে ব্যাঙ্ক পুঁজি এবং শিল্প পুঁজির মিশ্রণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক একাধিপত্যের (ফিনানসিয়াল অলিগর্কির) জন্ম দেয় এবং নিজ দেশের ভৌগোলিক সীমার বাইরে পুঁজি রপ্তানি করে। এইভাবেই সে সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়। লেনিনীয় এই বিশ্লেষণকে অভ্রান্ত প্রমাণ করে সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ার বৃহত্তম ব্যাঙ্কগুলি যেমন স্বেরব্যাঙ্ক, ভিটিবি ব্যাঙ্ক, আলফা ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক র‍্যাফেইনিজ প্রভৃতি বাস্তবে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের প্রত্যক্ষ মালিকানাধীন অথবা তাদের নিয়ন্ত্রণেই পরিচালিত হয়। একবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই প্রতি বছর ১৫ থেকে ২০ বিলিয়ন ডলার পুঁজি পশ্চিম ইউরোপের ব্যাঙ্কগুলোতে রাশিয়া থেকে রপ্তানি হতে শুরু করেছে। এফ ডি আই বা ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট অর্থাৎ বিদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরাসরি রুশ পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণও এই সময়ে উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০১ সালে রাশিয়া থেকে ৪৪.২ বিলিয়ন ডলার বিদেশে বিনিয়োগ হয়েছিল। ২০১২ সালে সেই বিনিয়োগের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০৬.২ বিলিয়ন ডলার। রুশ একচেটিয়া পুঁজি, ব্যাঙ্ক পুঁজি এবং শিল্পপুঁজির মিশ্রণের মাধ্যমে ফিনান্সিয়াল অলিগার্কিরও জন্ম দিয়েছে। বৃহত্তম ভদকা উৎপাদক কোম্পানি, খনি ও পরিবহণ কোম্পানি এবং রিয়েল এস্টেটের দৈত্যাকার পুঁজিপতিরাই রাশিয়ার ব্যাঙ্কিং এবং অন্যান্য আর্থিক ক্ষেত্রগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ভারত প্রভৃতি একচেটিয়া পুঁজিশাসিত দেশের মতো বর্তমান রাশিয়াতেও এইসব ধনকুবেরদের বেশিরভাগই রুশ কেন্দ্রীয় আইনসভা ডুমার সদস্য এবং রুশ বুর্জোয়া রাজনৈতিক দল ও সরকারি কর্তাব্যক্তিদের তারাই প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

২০০১ থেকে ২০১০-এর মধ্যে রাশিয়ার প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ ছিল বছরে ১০ বিলিয়ন ডলারের কিছু বেশি। সেটাই ২০১১ সালে একলাফে তিনগুণ বৃদ্ধি পায়। গত তিন বছরের মধ্যে রুশ পুঁজিপতিরা তাদের বিদেশি সম্পদের পরিমাণ আগের চেয়ে দ্বিগুণ বাড়িয়ে নিয়েছে এবং তাদের মুনাফা বেড়েছে আড়াই গুণ। গ্যাজপ্রোম, সেভারস্টাল, রাসাল প্রভৃতি রুশ কোম্পানিগুলো ২০১২ সালে ১৩৯ বিলিয়ন ডলার খরচ করে ৪২৭টি বিদেশি কোম্পানি কিনে নিয়েছে। রুশ আলফা ব্যাঙ্ক আমস্টারডাম ট্রেড ব্যাঙ্ককে কিনে নিয়েছে। আর একটি বড় রুশ ব্যাঙ্ক ভিটিবি ইউক্রেন, বেলারুশ, আর্মেনিয়া, জর্জিয়া প্রভৃতি দেশগুলোতে ৪০০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে এবং ভারত, চিন, ভিয়েতনাম, অ্যাঙ্গোলা সহ পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে তাদের পুঁজি বিনিয়োগ করছে।

একবিংশ শতকের রাশিয়া যে, পুঁজি রপ্তানি করা ও অর্থনৈতিক একাধিপত্যের জন্ম দেওয়ার মাধ্যমে পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে শুধু তাইই নয়, চিন, ব্রাজিল, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশের সঙ্গে বোঝাপড়ার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব বিস্তারের প্রতিযোগিতায় আমেরিকার সঙ্গে টক্কর নিচ্ছে। তবে মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বাধীন পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন যেভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনের সময় এশিয়া আফ্রিকার সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশগুলোর স্বাধীনতা এবং আন্তর্জাতিক নিয়ম কানুন প্রবর্তনের মাধ্যমে ঔপনিবেশিকতার অবসান ঘটিয়ে, বিশ্বশান্তির অতন্দ্র প্রহরী রূপে কাজ করত, এমনকি স্ট্যালিনোত্তর যুগেও বেশ কিছুকাল তার সামরিক শক্তি নিয়ে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের হাত থেকে এশিয়া আফ্রিকার দুর্বল দেশগুলোকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসত, তাদের অর্থনৈতিক ও নানারকম সাহায্য দিয়ে উন্নয়নে সহায়তা করত, বর্তমান রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধিতে কিন্তু সেরকম কোনও আশ্বাসের কারণ নেই। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যখন ইরাক, লিবিয়া প্রভৃতি দেশগুলোকে আক্রমণ করে সেগুলোকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে নির্বাচিত রাষ্ট্রনায়কদের হত্যা করে নিজেদের পুতুল সরকার বসিয়েছে, সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া কিন্তু তখন প্রতিবাদে একটা কথাও উচ্চারণ করেনি। স্পষ্টতই ঠিক একই কারণে রাশিয়ার বর্তমান ইউক্রেন আগ্রাসন নিয়েও মুখে কিছু প্রতিবাদ করলেও যুদ্ধবন্ধকরতে রাশিয়াকে বাধ্য করার গরজ আমেরিকা, চিন বা অন্যান্য সাবেক সাম্রাজ্যবাদীদের নেই। সকলেরই একই স্বার্থ— নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী দুর্বলতর দেশগুলোকে ভাগ বাঁটোয়ারা করে লুটেপুটে খাওয়া। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক শিবিরের মতো মহান লেনিন স্ট্যালিনের প্রদর্শিত সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক কোনও যথার্থ সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলাই পৃথিবী জুড়ে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধচক্রান্তকে রুখে দেওয়ার একমাত্র গ্যারান্টি হতে পারে। এছাড়া যুদ্ধ বন্ধের দ্বিতীয় কোনও পথ নেই।

(এমিলিয়ানো সার্ভি ও সালভাতোরে ভিকারিও-র লেখা নিবন্ধ 'নেচার অফ দি ক্যাপিটালিস্ট ইকনমিক স্ট্রাকচার অফ রাশিয়া' থেকে)

মদের প্রসারে সরকারি প্রচেষ্টার তীব্র প্রতিবাদ

রাজ্যের তৃণমূল সরকারের আবগারি দফতর মদের আরও প্রসার ঘটাতে ৩০০ মিলিলিটারের বোতলে মদ বিক্রির ভাবনার বিরোধিতা করে এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ২ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, "রাজ্য সরকারের আবগারি দফতর ৩০০ মিলিলিটারের বোতলে দেশি মদের জোগানের যে ব্যবস্থা করতে চলেছে তার আসল উদ্দেশ্য মদের বিক্রি বাড়ানো ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা অতীতে বারবার মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য মদের প্রসার বাড়ানোর তীব্র প্রতিবাদ করেছি।

সরকার গতকাল পুজোর ইউনেস্কো স্বীকৃতির অজুহাতে মিছিল করে ১ সেপ্টেম্বর থেকেই পুজো শুরু করে দিয়েছে। ৩০০ এমএল-এর বোতল চালুর এই সিদ্ধান্তের ফলে দীর্ঘায়িত উৎসবের মাসে আরও বেশি মদ বিক্রি হবে, গার্হস্থ্য হিংসা ও অশান্তি আরও বাড়বে, মহিলাদের উপর অত্যাচারের ঘটনাও বাড়বে। আমরা সরকারের এই সিদ্ধান্ত বাতিল করার দাবি করছি।

এমএসএস-এর প্রতিবাদ ঃ অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদিকা কল্পনা দত্ত ৫ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে জানান, মদের ছোট বোতল চালু করা আসলে রাজকোষ ভরানোর নামে মানুষকে আরও বেশি করে মদ খাওয়ানোর ষড়যন্ত্র। ফলে একদিকে যেমন মদে আসক্ত ব্যক্তি পরিবারের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে মদ কিনবে, তেমনই বাড়বে পারিবারিক অশান্তি, নারী নির্যাতন। মদ্যপ লম্পটদের হাতে শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ, গণধর্ষণের ঘটনাও পাল্লা দিয়ে বাড়বে।

প্লাবিত হবে কলকাতা

চারের পাতার পর

করা হবে, শিক্ষার কোনও আর্থিক দায়িত্ব সরকার আর বহন করবে না, তখন তাঁদেরও চোখে মুখে ফুটে উঠছে সর্বনাশের আশঙ্কা। যে শিক্ষানীতি মৌলিক গবেষণার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে গবেষণা ক্ষেত্রকে কর্পোরেট সংস্থার অর্থ উপার্জনের বিষয় করে তোলে, এমফিল ডিগ্রি তুলে দেয়, যে শিক্ষানীতি বিএ বিএসসি বিকমকে তিন বছরের বদলে চার বছরের কোর্সে পরিণত করার ব্যবসায়িক পরিকল্পনা করে, ইতিহাসকে বিকৃত করে, বিজ্ঞানের নামে অপবিজ্ঞানের চর্চা করতে চায়— গবেষক শিক্ষক অধ্যাপকরাও চান সেই নীতি বাতিল হোক। মেডিকেল ছাত্রদের দাবি 'সিবিএমই', 'নেক্সট' পরীক্ষা বাতিল করা হোক। এত রাগ ক্ষোভ-দাবি প্রতিবাদী মন— সে কি শুধু সাদা কাগজের পাতায় একটি স্বাক্ষরের মধ্যে বন্দি হয়ে থাকতে পারে? স্বভাবতই তা আত্মপ্রকাশ করতে চায়। চায় প্রতিবাদী শত ফুল বিকশিত হোক। প্রতিস্পর্ধী হাজার হাজার চেতনা প্রস্ফুটিত হয়ে শাসকের কাছে এ বার্তা পৌঁছে দিক— তোমাদের এই অগণতান্ত্রিক অবৈজ্ঞানিক সাম্প্রদায়িক শিক্ষানীতি আমরা মানি না। তাই আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর এআইডিএসও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি ডাক দিয়েছে ছাত্র বিক্ষোভ মিছিলের।

প্রস্তুতি চলছে স্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে, মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০, শিক্ষায় পিপিপি মডেল নীতি প্রত্যাহার, সকল শূন্যপদে স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ, সকল ছাত্রের ভর্তি ও পর্যাপ্ত ক্লাসরুম এবং সুষ্ঠু পঠন-পাঠনের দাবিতে দার্জিলিংয়ের পাহাড় থেকে সাগরদ্বীপ সবখান থেকেই সেদিন বন্যার বেগে আছড়ে পড়বে ছাত্র প্রতিনিধিদের ঢেউ কলকাতার রাজপথে। রাজধানী শহর কলকাতা প্লাবিত হবে এই সময়ের পশ্চিমবঙ্গে প্রতিবাদী ছাত্র জনতার অপ্রতিরোধ্য এক তরঙ্গে। ছাত্র সমাজের দাবি শিক্ষার অধিকার আমরা ছাড়ব না, 'টাকা যার শিক্ষা তার'— এই সর্বনাশা নীতি রুখবই। এ লড়াই সকলের, সমস্ত খেটে-খাওয়া মানুষের।

পাঠকের মতামত

ছাত্র আন্দোলনে অনন্য নজির

শিক্ষায় অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত ফি নেওয়ার প্রতিবাদে ছাত্র আন্দোলনে পুলিশ চার জন ছাত্রীসহ ১৩ জনকে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ও বয়স্ক মহিলা পুলিশ কর্মীদের শ্লীলতাহানির অভিযোগে জেলে পাঠিয়ে ন্যক্কারজনক নজির গড়ল কোচবিহারে। যখন অর্থাভাবে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষার আঙিনা থেকে দূরে চলে যাচ্ছে ঠিক এই সময় এই ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও লজ্জাজনক এবং এই ঘটনা সারা পশ্চিমবঙ্গ সহ গোটা ছাত্র সমাজে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

শুরুটা হয়েছিল কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ি নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে। এই কলেজে অতিরিক্ত ফি নেওয়ার ফলে বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী ভর্তি-ফি সংগ্রহ করতে পারেননি। সেই কারণে কলেজের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীরা 'স্টুডেন্টস ইউনিটি' গড়ে তুলে কর্তৃপক্ষের কাছে ফি মকুব করার দাবি জানাতে থাকে। ২৭ জুলাই থেকে ১৬ আগস্ট পর্যন্ত একটানা ১৯ দিন আন্দোলন চলে। কলেজ কর্তৃপক্ষ টালবাহানা করে কালক্ষেপ করতে থাকে। ১৬ আগস্ট ভর্তি প্রক্রিয়ার শেষ দিন ভর্তি হতে না পারা অসহায় ছাত্রছাত্রীরা অধ্যক্ষের দপ্তরের সামনে ধর্নায় বসে। কিছুক্ষণ পরে তৃণমূলের বহিরাগত ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী লাঠিসোঁটা নিয়ে উপস্থিত হয়। পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের উপর পুলিশ আক্রমণ নামিয়ে আনে। এই আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন করে ছাত্র সংগঠন অল ইন্ডিয়া ডিএসও এবং নেতৃত্ব দেয় সংগঠনের সদস্য কলেজ ছাত্র সুজয় বর্মন। তিনি পুলিশের আক্রমণে গুরুতরভাবে আহত হয়ে হলদিবাড়ি হাসপাতাল থেকে রেফার হয়ে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে আট ঘন্টা সংজ্ঞাহীন ভাবে ছিলেন। পরদিন ১৭ আগস্ট কোচবিহার পুলিশ সুপার দপ্তরে ডিএসও-র পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দিতে গেলে পুলিশ চারজন ছাত্রীসহ ১৩ জনের উপর বেধড়ক লাঠিচার্জ করে। সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ সহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর মিথ্যা মামলা দায়ের করে। যাদের প্রত্যেকেরই বয়স ১৭ থেকে ২৫।

আজ যে অসহায় দরিদ্র ছাত্রদের পড়াশোনার কথা বলতে গিয়ে পুলিশি নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে এবং জেলে যেতে হচ্ছে এই ঘটনায় মানুষ স্তম্ভিত। শিক্ষায় ফি বৃদ্ধির ঘটনা শুধু হলদিবাড়ি বা কোচবিহারের সমস্যা নয়, গোটা ছাত্র সমাজের। কিন্তু যে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলাগুলি ছাত্রদের উপর প্রশাসন দিয়েছে তা নগ্ন রাষ্ট্রীয় দমন পীড়নের ঘৃণ্য রূপ।

এ দেশের নবজাগরণের পথিকৃৎ রামমোহন বিদ্যাসাগর ও স্বাধীনতা আন্দোলনের মনীষীরা গণতান্ত্রিক শিক্ষা প্রসারে সার্বজনীন শিক্ষার কথা বলতে গিয়ে অবৈতনিক শিক্ষার কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, জ্ঞানভাণ্ডার মানব সভ্যতার সম্পদ। এই জ্ঞানভাণ্ডারের উপর সমস্ত মানুষের অধিকার আছে, তা কখনও বিক্রি করা চলে না। তাই শিক্ষা হবে সার্বজনীন, গণতান্ত্রিক। অর্থের কারণে যদি কেউ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয় তা হলে শিক্ষা তার গণতান্ত্রিক চরিত্র হারাবে। বর্তমানে যেভাবে অতিরিক্ত ফি-র বোঝা চাপিয়ে দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে শিক্ষাকে কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা সরকার করছে এবং তার প্রতিবাদ করলে পুলিশের দ্বারা যেভাবে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন নামিয়ে আনছে এতে রামমোহন বিদ্যাসাগরের মতো মনীষীদের শিক্ষাচিন্তা ওপর হামলার সমান। যা সাম্প্রতিক হলদিবাড়ি কলেজের ঘটনা প্রমাণ করে।

বুদ্ধদেব রায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়

হায় রে গণতন্ত্র!

একের পাতার পর

উঠেছে সমস্ত গণতান্ত্রিক মহল থেকে। বহু আইনজীবী, অবসরপ্রাপ্ত বিচারক, প্রাক্তন আমলা, শিক্ষাবিদ, মানবাধিকার কর্মী শীর্ষ আদালত এবং রাষ্ট্রপতিকে চিঠি লিখে এর প্রতিবাদ করেছেন। এস ইউ সি আই সি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ তিস্তার গ্রেফতারির তীব্র নিন্দা করে তাঁর মুক্তির দাবিতে আন্দোলনে এগিয়ে আসার জন্য জনসাধারণের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন।

কোন অপরাধে তিস্তাকে গ্রেফতার করেছিল গুজরাট সরকার? ২০০২ সালে গুজরাট দাঙ্গার সময় খুন হওয়া প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ এহসান জাফরির স্ত্রী জাকিয়া জাফরি এবং সমাজকর্মী তিস্তা শেতলবাদ যৌথ ভাবে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করে আর্জি জানান, ওই দাঙ্গায় গুজরাটের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে দেওয়া ক্লিনচিট খারিজ করুক আদালত। গত ২৪ জুন সুপ্রিম কোর্ট তাঁদের আবেদন খারিজ করে এবং এই আবেদনের পিছনে 'অন্য কোনও উদ্দেশ্য' থাকার কথা বলে।

এর পরেই গুজরাটের বিজেপি শাসিত সরকার তিস্তার বিরুদ্ধে আমেদাবাদ থানায় এফআইআর দায়ের করে। গুজরাট দাঙ্গার সাক্ষ্যপ্রমাণ জাল করার অভিযোগে গুজরাটের এটিএস মুম্বই থেকে গ্রেফতার করে তিস্তাকে।

শুনানিতে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, তিস্তাকে জামিন না দেওয়ার কোনও কারণ হাইকোর্টের ছিল না। প্রধান বিচারপতি শুনানিতে বলেন, এই মামলায় এমন কোনও অপরাধের উল্লেখ নেই, যে কারণে তিস্তাকে জামিন দেওয়া যায় না। উপরন্তু তিস্তা যেহেতু একজন মহিলা, তাই তাঁর জামিনে হাইকোর্টের তৎপরতা আবশ্যক ছিল। কোন নথিপত্র তিস্তা জাল করেছেন, এটিএস-এর করা এফআইআরে তারও কোনও উল্লেখ নেই। তা হলে কেন তিস্তার জামিন এ ভাবে আটকে রাখা হল?

পুরো ঘটনা থেকে স্পষ্ট, তিস্তাকে জেলে আটকে রেখে 'শিক্ষা' দেওয়াই এখানে সরকারের মূল উদ্দেশ্য। গুজরাট দাঙ্গার সময়ে নরেন্দ্র মোদি ছিলেন সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী। দাঙ্গার সময়ে সংখ্যালঘু মানুষকে রক্ষা করার তাঁর যে সংবিধান প্রদত্ত দায়িত্ব, তিনি তা পালন করেননি। মুখ্যমন্ত্রী হয়েও তাঁর বিস্ময়কর নিষ্ক্রিয়তা প্রকারান্তরে দাঙ্গায় অংশগ্রহণ ছাড়া কিছুই ছিল না। তাঁর নিষ্ক্রিয়তা দেশে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এতটাই ঝড় তুলেছিল যে, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীকেও আপাত নিরপেক্ষতা দেখিয়ে নরেন্দ্র মোদিকে রাজধর্ম পালনের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হয়েছিল প্রকাশ্যে। নরেন্দ্র মোদির এই জঘন্য ভূমিকা বিশ্ব জুড়ে নিন্দিত হয়।

সেদিনের মুখ্যমন্ত্রী আজ দেশের প্রধানমন্ত্রী। স্বাভাবিক ভাবেই প্রধানমন্ত্রী কিংবা তাঁর দল বিজেপির লক্ষ্য গুজরাট দাঙ্গার রক্তের দাগ গা থেকে মুছে ফেলা। আর এই দাগ মুছে ফেলতে সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ, বিরোধিতাকে তারা লোপাট করতে চেয়েছে। যাঁরা দাঙ্গার পিছনের ষড়যন্ত্রকে উদঘাটন করতে চেয়েছেন, দাঙ্গাকারীদের শাস্তি চেয়েছেন, তাঁদের কেউ এখন সাজানো মামলায় জেলে, কেউ খুন হয়ে গেছেন। এই অবস্থায় নতুন করে প্রধানমন্ত্রীর দিকে আঙুল তোলার স্পর্ধা শাসকের দম্ভে আঘাত করেছে। তাই তিস্তাকে জেলে ভরে দৃষ্টান্ত তৈরি করে সমস্ত প্রতিবাদীদের সহবত শেখানোর জন্য ষড়যন্ত্রে নামে গুজরাট সরকার। এটিএস তিস্তাকে গ্রেফতার করে যে অভিযোগে তা এতই মিথ্যা যে তারা এফআইআরে তার উল্লেখও করতে পারেনি।

প্রধান বিচারপতি গুজরাট হাইকোর্টের ভূমিকারও যে ভাবে তীব্র ভর্ৎসনা করেছেন তাতে বিচারবিভাগের নিরপেক্ষতাও প্রশ্নের ঊর্ধ্বে থাকে না। তিনি বলেছেন, একজন মহিলার জামিনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গুজরাট সরকারকে বক্তব্য জানানোর জন্য ছয় সপ্তাহ সময় দেওয়াটা নজিরবিহীন। স্বাভাবিক ভাবেই এ প্রশ্ন উঠছে যে, এটা যে নজিরবিহীন তা কি হাইকোর্টের বিচারপতির অজানা? তা যদি না হয় তবে কেন তিনি এমন ভূমিকা নিলেন? জনমনে এই সন্দেহ যে দৃঢ় হয়েছে, এটা শাসকের অন্যায় চাপের কাছে ন্যায়ালয়ের নতি স্বীকার, কথাটা তো উড়িয়ে দেওয়া মুশকিল।

সরকারি ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সব স্তম্ভগুলিকে গ্রাস করার এক সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র চালাচ্ছেন বিজেপি নেতারা। বিচার ব্যবস্থাকেও প্রভাবিত করে নিজেদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করা, সেই ষড়যন্ত্রেরই অঙ্গ। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ এই ষড়যন্ত্রকেই স্পষ্ট করেছে। এই ঘটনায় আরও স্পষ্ট হল, গণতন্ত্রের অন্যতম অঙ্গ যে ব্যক্তিস্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতা, বিরোধিতার অধিকার, গায়ের জোরে, সরকারি ক্ষমতার জোরে এই সবগুলিকেই আজ লঙ্ঘন করছে, সেগুলির টুঁটি চেপে ধরছেন প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর দল। প্রধানমন্ত্রী যতই সংবিধানে মাথা ঠেকান, সংবিধানের প্রতি, গণতন্ত্রের প্রতি আনুগত্যের চিহ্নমাত্র তাঁর আচরণে নেই। না হলে একজন মহিলাকে কি এ ভাবে জামিনের জন্য সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে হয়! এ তো পুরোপুরি স্বৈরাচার।

কিন্তু আজ সময় এসেছে দেশের নাগরিকদের পক্ষ থেকেও প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর দলকে সহবত শেখানোর। প্রধানমন্ত্রীকে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার, তিনি যে বিক্রান্তকে দেশের গৌরব বলেছেন, তা যদি প্রতিরক্ষা বাহিনীর হাতে এক শক্তিশালী হাতিয়ার হয়, তবে তা কার প্রতিরক্ষার জন্য? দেশের জন্য তো? দেশ মানে কি শুধু দেশের জমি, পাহাড়, জল আর জঙ্গল? দেশের মানুষ নয়? সেই মানুষ যদি এ ভাবে বে-আইনের দ্বারা, ক্ষমতাসীনদের দ্বারা, প্রতিহিংসার দ্বারা পদে পদে লাঞ্ছিত হয়, শৃঙ্খলিত হয়, তবে শুধু শক্তিশালী যুদ্ধজাহাজের দ্বারা দেশের গৌরব রক্ষা হতে পারে কি? পারে না। তাই দেশের সত্যকার গৌরব রক্ষার জন্য, দেশের প্রতিটি নাগরিককে এই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসতে হবে।

জীবনাবসান

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার পূর্বতন হাড়দহ-বাঁশড়া-নারায়ণপুর লোকাল কমিটির সদস্য, কমরেড পালান হালদার ২৬ আগস্ট ঘুটিয়ারি শরিফ হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭১ বছর।

৭০ দশকের শুরুতেই তিনি দলের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি দলের নানা কর্মসূচিতে নিজেকে যুক্ত করেন। প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ও পাশফেল চালুর দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ঘুটিয়ারি শরিফ থেকে কালাবড় রাস্তা সংস্কারের আন্দোলন, হরিহর মহাবিদ্যালয়ের উন্নয়নে আন্দোলন, স্কুলে বর্ধিত ফি প্রত্যাহারে অভিভাবকদের আন্দোলন, ঘুটিয়ারি শরিফ হাসপাতাল উন্নয়নের আন্দোলনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানে তিনি যুক্ত ছিলেন। কিছু প্রতিষ্ঠানে পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন। কর্মী সমর্থক দরদি ও ছোটদের সাথে তাঁর সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। বহু দরিদ্র পরিবার এবং দুঃস্থ পার্টিকর্মীদের তিনি সাহায্য করতেন। পরিবারের সদস্যদের দলের চিন্তার সংস্পর্শে এনেছিলেন। দীর্ঘ অসুস্থতার সময়েও নিয়মিত গণদাবী ও বইপত্র পড়তেন এবং পার্টির কাজকর্মের সম্বন্ধে খোঁজ রাখতেন। কাজকর্ম নিয়ে পরামর্শ দিতেন। তাঁর প্রয়াণে দল হারাল একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে, সাধারণ মানুষ হারাল তাদের আপনজনকে।

তাঁর মরদেহ বাড়িতে নিয়ে এলে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান ক্যানিং সংগঠনিক জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড বাদল সরদার ও উপস্থিত জেলা কমিটির সদস্যরা। গণসংগঠনের কর্মী, ক্লাব সহ অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সদস্যরাও মাল্যদান করেন। ৩ সেপ্টেম্বর ঘুটিয়ারি শরিফ প্রগতি নাট্যমঞ্চে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নন্দ কুণ্ডু।

কমরেড পালান হালদার লাল সেলাম

ছিল দুটি স্কুল, হল একটি, আর একটি কোথায় গেল?

দুই বন্ধুর কথোপকথন

— ভাই, আজ একটা জায়গায় যাবি? আমার সেই বন্ধু ফোন করেছিল, ওরা আজ একটা প্রতিবাদ মিছিল করবে।

— প্রতিবাদ? কীসের প্রতিবাদ?

— ওদের গ্রামে একটা সরকারি স্কুল বন্ধ করে দিয়েছে, তার প্রতিবাদেই ওরা ...

— আরে ভাই, ওটা আমি জানি। ওটা মোটেই কেউ বন্ধ করেনি, মার্জ করে দিয়েছে।

— মার্জ করেছে মানে?

— মানে, দুটো স্কুল ছিল তো? দুটোতেই ছেলেপুলে কম হচ্ছিল, তা দুটোকে মিলিয়ে একটা স্কুল করে দিয়েছে।

— দুটো স্কুল ছিল, একটা স্কুল হল। তা হলে আর একটা স্কুল এর কী হল?

— হ্যাঁ মানে সেটা অবশ্য বন্ধই হয়ে গেল, কিন্তু ...

— ভাই, এ তো সবে শুরু। খবর শুনিস? খবরের কাগজ পড়িস? রাজ্যে রাজ্যে কত সরকারি স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে খোঁজ রাখিস? সরকার তো রীতিমতো বুক ফুলিয়ে বলছে, সরকারি স্কুলগুলো তুলে দেবে, সরকারি স্কুলে শিক্ষক পদগুলোতে আর নিয়োগই হবে না। গোটা দেশে প্রায় ৫১ হাজার স্কুল উঠে গেছে। এসবের জন্যই তো ওরা পথে নামছে, প্রতিবাদ করছে।

— তোর ওই বন্ধুদের মাথায় গণ্ডগোল আছে। একটা বিষয় ভাল করে কিছু জানলই না, নেমে পড়ল রাস্তায়। কী? না প্রতিবাদ করবে। আচ্ছা, সরকারি স্কুলে যদি লোকজন বাচ্চাদের না-ই পাঠায়, তা হলে কী হবে ওই স্কুলগুলো রেখে? তুই বল তো, তুই নিজের বাচ্চাদের সরকারি স্কুলে পড়তে পাঠাবি?

— বাঃ। দারুণ বললি তো। আমার বাচ্চারা সরকারি বাসে চড়ে না, তা হলে সরকারি বাস তুলে দাও। আমার বাচ্চারা ট্রেনে চড়ে না, ট্রেন তুলে দাও। ওরা যখন সরকারি স্কুলে যায় না, সরকারি স্কুলগুলো সব তুলে দাও। এটা কোনও যুক্তি হল?

— আচ্ছা, তোর কথা ছাড়। তুই আমায় বল, সরকারি স্কুলগুলোয় যারা পড়ায়, তারাই কি নিজের ছেলেমেয়েকে সরকারি স্কুলে পড়তে পাঠায়?

কেন পাঠায় না বল তো? এটা কখনও ভেবে দেখেছিস? পাঠায় না কারণ, সরকারি স্কুলগুলোয় পড়াশুনার কোনও পরিবেশই নেই। ক্লাসরুম নেই, বিল্ডিং নেই, বসার বেঞ্চ নেই, টিচার নেই, পানীয় জল নেই, শৌচালয় নেই বা থাকলেও এমন অবস্থা যে সেখানে ঢুকলেই মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়বে। গ্রামের দিকের অনেক স্কুলে তো মাথার ওপর ছাদও নেই। সরকারি স্কুলগুলোর তো এই হাল বানিয়ে রাখা হয়েছে, কোন বাবা-মা বাচ্চাদের সেখানে পাঠাতে চাইবে বল তো?

— আচ্ছা মেনে নিলাম, অনেক স্কুলের অবস্থা খারাপ। কিন্তু সব স্কুল তো এ-রকম নয়, অনেক স্কুলে ভাল ব্যবস্থা আছে, শিক্ষকও আছে। ...

— দেখবি সেখানে ছাত্ররাও আসে। যে সব সরকারি স্কুলে সত্যিই ভাল ব্যবস্থা আছে, পর্যাপ্ত শিক্ষক আছে, পড়াশুনা হয়, সেখানে লোকে ছেলেমেয়েদের অবশ্যই পাঠায়। আরে বাবা, একটা ভাল স্কুলে কেন ছাত্র আসবে না? সরকারি স্কুলগুলোকে তেমন করে তৈরি করতে হবে তো, যাতে লোকে সন্তানদের সেখানে পাঠাতে চায়?

— তা কর না। সরকারি স্কুলের টিচাররা ঠিক মতো পড়ালেই তো স্কুলগুলোর হাল ফিরে যায়। করতে কে বারণ করেছে?

— ভাই, আমরা তো জঙ্গলে থাকি না, থাকি একটা মানুষের সমাজে। এরকম নিজের মর্জি মতো খেয়ালখুশি মতো সবকিছু চলে জঙ্গলে। বাঘের মনে হল, একটা পশুকে ধরে খেল, মনে হল না খেল না। হরিণ দৌড়ে বাঁচতে পারল তো পারল, না হলে বাঘের পেটে গেল। একটা সমাজে, প্রশাসনিক ব্যবস্থায় এ জিনিস চলে না। এখানে আইন-কানুন আছে, পুলিশ-প্রশাসন আছে, বিভিন্ন দপ্তর, তার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা আছেন। টিচার যাতে ঠিক মতো পড়ান, তা দেখার জন্য হেডস্যার আছেন, হেডস্যারদের কাজ দেখার জন্য এসআই আছে, তার ওপর ডিআই আছে, শিক্ষামন্ত্রী আছেন, মুখ্যমন্ত্রী আছেন। এরকম স্তরে স্তরে প্রত্যেকের মাথার ওপর লোক বসে আছে, কাজ করিয়ে নেওয়া, কাজ যাতে ঠিকমতো হয় সেটা দেখাই তাদের দায়িত্ব। সরকারি স্কুলে যদি পড়াশুনা না হয়, টিচাররা যদি না পড়ায়, সেটা শুধু তাদের ব্যর্থতা নয়, পুরো সিস্টেমের দায়।

— বাঃ, তার মানে তুই বলছিস, কোথায় কোন অজ-পাড়াগাঁয়ের কোন টিচার পড়াচ্ছে না, তার দায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর?

— আলবাৎ। মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী এরা কী জন্য আছেন? একজন শিক্ষামন্ত্রী যদি স্কুলগুলোর অবস্থা না জানেন, শিক্ষকরা কেন পড়াচ্ছেন না, কোথায় সমস্যা, বাচ্চারা কেন আসছে না, এগুলো নিয়ে যদি তাঁর মাথাব্যথা না থাকে, তিনি কিসের শিক্ষামন্ত্রী? তাঁকে মন্ত্রী করে লাভটা কী? এই দেখ, তুই বলছিস তো যে, স্কুলে শিক্ষকরা পড়ান না? অথচ এই শিক্ষকরাই কিন্তু হাজার রকমের সরকারি কাজ সারা বছর করেন। মিড ডে মিলের হিসাব লেখা, ভোটের ডিউটি, বাড়ি বাড়ি সার্ভে করে রিপোর্ট তৈরি করা, কন্যাশ্রী-সবুজ সাথী থেকে শুরু করে একগাদা সরকারি প্রকল্পের কাজ। এমনকি গ্রামের দিকে লোকে খোলা জায়গায় শৌচকর্ম করছে কি না এটা দেখতেও সরকারি স্কুলশিক্ষকদের পাঠানো হয়। এই কাজগুলো তারা ঠিকমতো করেন কী করে? করেন কারণ, সরকার তাদের দিয়ে এই কাজগুলো করাতে চায়, এই কাজগুলোই করাতে চায়। তাই এই কাজগুলো হয়েও যায়। না করলে তার জন্য সরকারের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। অথচ, শিক্ষকের যা আসল কাজ, সেই পড়ানোর ক্ষেত্রে কোনও জবাবদিহি কোনও নজরদারির বিষয় নেই। কিছু শিক্ষক এর সুযোগও নিচ্ছেন, তাঁরা সত্যিই পড়াচ্ছেন না। তারা জানেন যে, পড়ানো নিয়ে সরকারের মাথাব্যথা নেই, বরং এতে সরকারেরই সুবিধা। পড়াশুনা না হলে ছাত্ররা এসব স্কুলে আসবে না, আর দুদিন পরে 'ছাত্র হচ্ছে না' এই অজুহাতে দিব্যি সরকারি স্কুলগুলোয় তালা ঝোলানো যাবে, ছেলেমেয়েরা সব ভিড় করবে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা প্রাইভেট স্কুলগুলোয়, যেখানে ভর্তি থেকে শুরু করে পাশ করে বেরোনো অব্দি সবটাই লাখ লাখ টাকার কারবার। শিক্ষকরা পড়ালেই সরকারি শিক্ষার হাল ফিরে যাবে, কেউ ঘুষ না নিলেই দেশে আর দুর্নীতি থাকবে না, সবাই চারপাশ পরিষ্কার রাখলেই পরিবেশ দূষণ কমে যাবে, এগুলো হচ্ছে বোকা বানানো কথা। এরকম নিজে নিজে কিছু হয় না ভাই, করাতে হয়, করিয়ে নিতে হয়। তুই আমি কী করব, কী ভাবব, কী ভাবে চলব— সব কিন্তু ঠিক করে দেয় সিস্টেম, আর সিস্টেম যেটা সত্যিই দরকার মনে করে, সেটা ঠিক করিয়ে নেয়। আসল কথা হল, সরকার নিজেই চায় না যে সরকারি স্কুলগুলোর হাল ফিরুক।

— কেন? এটা করে সরকারের কী লাভ?

— হাসালি ভাই। কী লাভ দেখছিস না? এই যে প্রাইভেট স্কুলগুলো সরকারের নাকের ডগায় বসে যা খুশি তাই ফি নিচ্ছে, এমনকি করোনার সময় যখন দু-বছর স্কুল বন্ধ থাকল, তখনও এরা টাকা নিতে ছাড়েনি। এসব নিয়ে কত বিক্ষোভ হল, অভিভাবকরা আন্দোলন করলেন, সরকার কোনও ব্যবস্থা নিল? লোক দেখানো একটা কমিটি করল, স্কুলগুলোর হেডদের ডেকে মুখ্যমন্ত্রী একবার একটু নরম করে ধমকে দিলেন, ব্যস। কাজের কাজ কিছু হল? বরং, করোনার পরে লোকের যখন সংসার চালানোই দায়, তখন এইসব স্কুলগুলো ফিজ আরও বাড়িয়েছে, এমনকি ফি বাড়া নিয়ে কোনও বিক্ষোভ-আন্দোলন করা যাবে না বলে কলকাতার কয়েকটা স্কুল মুচলেকা লিখিয়ে নিচ্ছে অভিভাবকদের দিয়ে। ভাবতে পারিস? সরকার এতে মদত দিচ্ছে কেন? দিচ্ছে, কারণ সরকার জানে, এসব স্কুলের মাথায় বসে থাকা ব্যবসাদাররা টাকা না ঢাললে, বছর বছর ভোটে জিতে গদিতে বসা হবে না। তাই কি কেন্দ্র, কি রাজ্য সব সরকারই চাইছে শিক্ষার দায়দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে সব ব্যবসায়ীদের বেচে দিতে। পিপিপি মডেল শুনিসনি? সবটাই গট আপ ভাই।

— সে তুই যাই বল, সরকার কিন্তু অনেক মাইনে দেয় টিচারদের। সেখানে প্রাইভেট স্কুলে মাইনে দেখ, বড়জোর কুড়ি পঁচিশ হাজার টাকা। সরকারি টিচাররা এত মাইনে কী জন্য পাবে বল তো?

— হ্যাঁ এই কথাটা এখন খুব ঘুরছে বাজারে, টিচারদের নাকি অনেক মাইনে। আমাদের গরিব দেশে আজ যদি শিক্ষকদের মাইনে কমিয়ে কুড়ি হাজার করে দেয়, দশ হাজারে পড়ানোরও লোক পাওয়া যাবে। দশ হাজার টাকা মাইনে চালু করলে আর একদল বলবে, আমরা পাঁচ হাজারে পড়িয়ে দেব, এভাবে আর কত পিছনের দিকে এগোবি ভাই? প্রাইভেট স্কুলে যে অল্প টাকা দিয়ে শিক্ষকদের এত খাটায়, সেটা তো অন্যায়, অমানবিক। সেটাই কি হওয়ার কথা ছিল? অথচ শিক্ষা যে আমাদের অধিকার, প্রতিটি নাগরিকের শিক্ষা যে সরকারের দায়িত্ব, এ নিয়ে আমরা ভাবি না। তুই ইতিহাস পড়, খবর নে, যেসব দেশ নানা ফিল্ডে সত্যিই উন্নতি করেছে, সেখানে শিক্ষা স্বাস্থ্যের মতো জরুরি বিষয়গুলো হয় অবৈতনিক, নয় তো একেবারে ন্যূনতম খরচে মানুষ শিক্ষার সুযোগ পায়, চিকিৎসা পায়। আমাদের দেশের ইতিহাসই পড়। আমাদের দেশের সব বড় মানুষরা কী বলেছেন? সবার জন্য শিক্ষা চাননি? টাকা দিয়ে কিনতে হলে শিক্ষা কোনও দিন সবার হবে?

— সেই, সেই আবার ফ্রি-তে চাইছিস তো? শিক্ষা ফ্রি, স্বাস্থ্য ফ্রি, যাতায়াত ফ্রি। সব তোদের ফ্রি চাই, সবকিছুতে ভর্তুকি চাই। কেন? সরকার তোকে ফ্রি তে সব দেবে কেন?

— এই হচ্ছে সরকারের আর একটা চালাকি। ফ্রি তে তোকে কে কী দিচ্ছে ভাই? তুই ট্যাক্স দিস না? দিস তো? সব জিনিসে ২৮ শতাংশ পর্যন্ত জিএসটি দিস। দুধ, দই, জল, ওষুধ, চাল, ডাল, জামাকাপড় কোনও একটা কিছু নেই, যাতে আমরা সরকারকে ট্যাক্স দিচ্ছি না। এমনকি করোনার হাত থেকে বাঁচতে দেশের মানুষ যে ভ্যাক্সিন নিতে বাধ্য হয়েছে, সেখানেও ট্যাক্স নিয়েছে সরকার। তা তোর আমার মতো কোটি কোটি সাধারণ মানুষের থেকে এত ট্যাক্স নিয়ে, সরকার যদি শিক্ষা স্বাস্থ্যের মতো মৌলিক জিনিসগুলো আমাদের না দিতে পারে, সেই সরকারের দরকারটা কী বল তো? কই, ক্লাবগুলোর পুজোর জন্য কোটি কোটি টাকা দিতে তো সরকারের টাকার অভাব হচ্ছে না?

আর একটা কথা বলি, কিছু মনে করিস না। আমরা আজকাল বড় স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছি। আমরা যখন প্রাইভেটাইজেশনের পক্ষে গলা ফাটাই, সরকারি স্কুল উঠে যাওয়া নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না, তখন শুধু নিজেদের কথা ভাবি। আমাদের অনেকের হয়তো আজ দশ বিশ হাজার খরচ করে সন্তানকে বেসরকারি স্কুলে পাঠানোর ক্ষমতা আছে, কিন্তু মনরেগা'র ওই মজুরেরা? তোর আমার বাড়িতে যারা কাজ করেন, সেই পরিচারিকাদের সন্তানরা? অতিমারিতে যে লক্ষ লক্ষ মানুষের চাকরি গেল, তাদের সন্তান? এরা কোথায় পড়বে? নাকি গরিব হয়ে জন্মেছে বলে সরকারি স্কুলের মোটা চালের মিড ডে মিল আর খোলা আকাশের তলায় পাঠশালা স্কুল পর্যন্তই ওদের অধিকার? আর একটা কথা মনে রাখিস, তোর-আমার ছেলে আজ বাদে কাল স্কুলের গণ্ডি পেরোলে আমরা কিন্তু সরকারি কলেজ সরকারি ইউনিভার্সিটিই খুঁজব। কারণ, আজও উচ্চশিক্ষায় এসব সরকারি প্রতিষ্ঠানের ডিগ্রির যে মূল্য মর্যাদা আছে, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোর তা নেই। তাই তখন আমরাও সন্তানের জন্য সরকারি শিক্ষাই খুঁজব, শুধু আজ ইংলিশ মিডিয়ামের গুমোরে সরকারের এই চালটা ধরতে পারছি না।

— ধরতে পেরেই বা কী হবে ভাই? তোর আমার কথা কে শুনবে?

— মজার কথা কী জানিস, আমরা আগেই ভাবি কেউ কিছু শুনবে না, কেউ কিছু করবে না। অথচ দেখ, যারা সরকারের এই অভিসন্ধিটা ধরতে পেরেছে, শুধু ধরতেই পারেনি এই সর্বনাশ আটকাবে বলে পথে নেমেছে, সরকার তাদের মিথ্যে মামলা দিয়ে জেলে আটকে রেখেছে। আমাদের রাজ্যেই এত বড় ঘটনা ঘটল, আমরা ক'জন জানি? ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে তো অন্তত পারি আমরা। পারি না বল?

আটের পাতায় দেখুন

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

ধর্ষকদের মুক্তির প্রতিবাদে
কলকাতায় নাগরিক সভা

গুজরাট গণহত্যা ছিল স্বাধীন ভারতের জঘন্যতম অপরাধ। বিজেপির বদান্যতায় স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবের অমৃতটা দেশের জঘন্যতম অপরাধীরা আস্বাদন করল, আর গরলটা ধারণ করল নির্যাতিতা বিলকিস, অথচ হওয়ার কথা ছিল বিপরীত। প্রধানমন্ত্রী অপরাধীদের ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমে শুধু সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নয়, গোটা দেশের মহিলাদেরও নিরাপত্তাহীনতার সামনে ঠেলে দিলেন। গুজরাটের বিলকিস বানোর ধর্ষণকারী ও তার শিশুকন্যা সহ পরিজনদের হত্যাকারী ১১ জন অপরাধীকে জেল থেকে সম্পূর্ণ বেআইনি ভাবে মুক্ত করার প্রতিবাদে ২ সেপ্টেম্বর নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটি আয়োজিত কলেজ স্কোয়ারের মহাবোধি সোসাইটি হলে এক প্রতিবাদ সভায় এ কথা বলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্তী। সভার শুরুতে কমিটির সম্পাদিকা কল্পনা দত্ত কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। মানবাধিকার আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা অধ্যাপক সুজাত ভদ্র বলেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর সংখ্যাগুরুবাদীদের অত্যাচারের যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের দেশে বিজেপি চালু করতে চাইছে এই ঘটনা তারই অংশ। যেভাবে অপরাধীদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাতে দেশের আইনকেও লঙ্ঘন করা হয়েছে বলে তিনি বলেন।

অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার বলেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর দল দেশের ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে যে ভাবে হিংসা ও বিদ্বেষের জায়গায় নিয়ে গেছেন তা আমাদের মাথাকে লজ্জায় নত করে দেয়। ব্রাহ্মণ ও সংস্কারী জঘন্য অপরাধীদের ছেড়ে দেওয়া একটা বিশেষ মতাদর্শের পরিচয়, যা বিজেপি এ দেশে আনতে চাইছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক অভিজিৎ রায় বলেন, বিজেপি দেশে ফ্যাসিবাদ কায়েম করতে চাইছে। অপরাধীদের ছেড়ে দেওয়ার ফলে অত্যাচারিতের নিরাপত্তা বলে কিছু থাকল না।

বিশিষ্ট সমাজকর্মী অধ্যাপক কাঞ্চন দাশগুপ্ত বলেন, আজ সারা দেশের বিচারব্যবস্থা, প্রশাসন সমস্ত কিছুকে শাসক শ্রেণি কুক্ষিগত করে রেখেছে। ফলে ন্যায়বিচারের জন্য শুধু বিচারব্যবস্থার দিকে তাকিয়ে না থেকে প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সভার শেষে সভাপতি বিশিষ্ট চিকিৎসক অশোক সামন্ত সর্বত্র সমস্ত স্তরের মানুষকে নিয়ে নারী নিগ্রহ বিরোধী প্রতিরোধ কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সকলেই তাঁর আহ্বানে সম্মতি জানান।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক সমাবেশে পুলিশ ও আওয়ামী লিগ সন্ত্রাসীদের আক্রমণের নিন্দা
বাসদ (মার্কসবাদী)-র

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সমন্বয়ক মাসুদ রানা ১ সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে দেওয়া এক বিবৃতিতে নারায়ণগঞ্জে বিএনপির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর শোভাযাত্রার মিছিলে পুলিশের গুলিতে যুবদল কর্মী শাওন নিহত হওয়ার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ ও নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন, "বর্তমান আওয়ামী ফ্যাসিবাদী সরকার বিরোধী মত দমনে হামলা, মামলা, গ্রেফতার, পুলিশি নির্যাতন, দলীয় বাহিনী দিয়ে আক্রমণ ও বিনা বিচারে হত্যার পথ বেছে নিয়েছে। শান্তিপূর্ণ মিছিল, মিটিং, সমাবেশের মতো গণতান্ত্রিক কর্মসূচিতেও পুলিশ বাহিনী ও দলীয় সন্ত্রাসীদের দিয়ে হামলার ঘটনা প্রতিদিনই ঘটছে। সরকার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য গুম করার মতো রোমহর্ষক পথ বেছে নিয়েছে।"

তিনি আরও বলেন, "ভোটডাকাতির নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসীন আওয়ামী লিগ সরকার বৃহৎ ব্যবসায়ীদের স্বার্থে নেওয়া গণবিরোধী সিদ্ধান্ত জনগণের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। সমস্ত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করেছে। ফলে আওয়ামী ফ্যাসিবাদ জনজীবনে যে ভয়াবহ সংকট সৃষ্টি করেছে তার বিরুদ্ধে জনগণের রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দিতে গণআন্দোলন গড়ে তোলার বিকল্প নেই।"

তিনি অবিলম্বে নারায়ণগঞ্জের ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যদের বিচারের আওতায় আনার জোর দাবি জানান। একই সাথে গণতান্ত্রিক কর্মসূচিতে পুলিশি বাধা ও দলীয় সন্ত্রাসীদের হামলা বন্ধ করার দাবি জানান তিনি।

বিপুল রাজস্ব ক্ষতি করে
শিল্পপতিদের কর কমালো কেন্দ্রীয় সরকার

কর্পোরেট সংস্থার কর কমিয়ে ২২ শতাংশ করার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের ১.৮ লক্ষ কোটি টাকা রাজস্ব লোকসান হয়েছে। করোনার আগে থেকেই অর্থনীতির শ্লথগতি কাটানোর কথা বলে কর্পোরেট করের হার কমিয়েছে বিজেপি সরকার। কিন্তু নতুন লগ্নি হয়নি, কর্মসংস্থানও হয়নি। বদলে শুধুই বেড়েছে কর্পোরেট সংস্থার মুনাফা।

সংসদীয় কমিটির রিপোর্টে জানা গেছে, ২০১৯-এ কর্পোরেট কর কমানোর ফলে করোনার দু'বছরে কেন্দ্রের রাজস্ব লোকসান হয়েছে ১.৮৪ লক্ষ কোটি টাকা। ২০২০-২১ এ নতুন রেকর্ড তৈরি হয়েছে— সরকারের কর্পোরেট কর বাবদ আয়ের তুলনায় মানুষের থেকে আদায় করা আয়কর বাবদ আয়ের পরিমাণ বেশি। শুধু ওই বছরই সরকারের রাজস্ব আয় ১ লক্ষ কোটি টাকা কম হয়েছে।

গার্মেন্টস শ্রমিকরা
মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলনে

গার্মেন্টস (দর্জি) শ্রমিকদের সারা বছরের কাজ নেই। নামমাত্র মজুরি। অসংগঠিত থাকার সুযোগে অত্যন্ত কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য করে ওস্তাগররা। তার উপর ওস্তাগরের ঘর থেকে কাজ দেওয়া নেওয়ার পথে শুরু হয়েছে তোলাবাজির জুলুম। দিন রাত হাড়ভাঙা পরিশ্রমে এদের জীবনে নেমে আসে অকালবার্ধক্য। সরকার গার্মেন্টস শিল্প থেকে হাজার হাজার কোটি টাকার ট্যাক্স তুলে রাজকোষ ভরালেও এঁদের জন্য কোনও সামাজিক সুরক্ষা নেই। প্রতিবাদে ৩১ আগস্ট উত্তর ২৪ পরগণার বাদুড়িয়া ব্লকের গার্মেন্টস শ্রমিকরা দাবি সংবলিত প্ল্যাকার্ড হাতে মিছিল করে ব্লক শ্রমদপ্তরে বিক্ষোভ দেখান এবং আধিকারিকের কাছে স্মারকলিপি দেন। দাবিপত্রে সরকারি পরিচয়পত্র, মজুরিবৃদ্ধি, সামাজিক সুরক্ষা, ষাটোর্ধ্ব সেলাই শ্রমিকদের কমপক্ষে মাসিক ৬০০০ টাকা বার্ধক্য ভাতা ইত্যাদি দাবির সাথে রাস্তায় তোলাবাজির জুলুম বন্ধের দাবি জানান।

বিক্ষোভ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন সারা বাংলা গার্মেন্টস (দর্জি) শ্রমিক ইউনিয়নের রাজ্য কমিটির সভাপতি কমরেড নন্দ পাত্র। উপস্থিত ছিলেন গণআন্দোলনের নেতা দাউদ গাজি।

কথোপকথন

সাতের পাতার পর

— রাগ করিস না ভাই, তবে তোর কথা মানলে বলতে হয় আমাদের পুরো ব্যবস্থাটাই খারাপ, গোড়াতেই গলদ।

— একশো বার। সেই গলদ সারাবার ব্যবস্থা না করে, ব্যবস্থাটাকে না পাল্টে সরকারি রেল সরকারি হাসপাতাল সরকারি স্কুল সব বেচে দাও, এটা কী ধরনের যুক্তি ভাই? সরকারটাই বা তা হলে সরকারি থাকে কেন? ওটাকেও বেচে দিলেই হয়।

— তবে যাই বলিস, টিচারদের এই ষাট-সত্তর হাজার টাকা মাইনে কিন্তু মেনে নেওয়া যায় না। সপ্তাহে ছুটি, সারা বছর এই ছুটি, সেই ছুটি, ছ ঘন্টা স্কুল আর এত মাইনে। আমাদের দেখ, দিনভর খেটে দুটো পয়সা জোগাড় করতে ঘাম ছুটে যায়।

কী হল, হাসছিস যে?

— এখানেই আসল সমস্যা ভাই রে। আমি একটা চোখে দেখতে পাই না, পাশের লোকটার দু'চোখ নষ্ট হয়ে গেলে আমি খুশি হই, আর আমাদের এই দুর্বলতাটা সরকার খুব ভালো চেনে। তাই সরকার কী করে জানিস? আজ মুসলমান, কাল দলিত, পরশু এসসি-এসটি এমন হাজার শত্রু খাড়া করে আমাদের সামনে। দেখাতে চায়, ওদের জন্যই তোর আমার সমস্যা। এই যেমন এখন তুই ভাবছিস, শিক্ষকরা অনেক মাইনে পায়, তাই ওরা তোর শত্রু। আসল শত্রুকে তুই দেখতে পাচ্ছিস না। কাজের কাজ কখন হবে জানিস? যখন এই জাত-ধর্ম পেশা ভুলে আমরা সব মানুষ এক হয়ে দাঁড়াতে পারব, সরকারের দিকে আঙুল তুলে বলতে পারব —আমার পাশের মানুষটার দুটো চোখ তো থাকবেই, আমার নষ্ট চোখটার দায়িত্বও তোমায় নিতে হবে। তখন বুঝব তুমি কেমন সরকার, জনগণের কেমন অভিভাবক। তবে এখানে জনগণেরও একটা ভূমিকা আছে। ওই যে সিকোয়েন্সটা বলেছিলাম— টিচার-হেডস্যার-এসআই-ডিআই-শিক্ষামন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রী— এই পিরামিডের চূড়ায় বসতে হবে জনগণকে, যারা দেখভাল করবে সরকারের কাজ। এ বার বুঝলি তো জনগণের ভূমিকা।

(সোসাল মিডিয়া থেকে সংগৃহীত)

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com